দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

ড্রাগনের কূটচালে
মতিভ্রষ্ট নেপাল
— পৃঃ ৫

করোনা মহামারী ও
আমাদের ভবিষ্যৎ
— পৃঃ ৭

৭২ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ২৭ জুলাই, ২০২০।। ১১ শ্রাবণ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

করোনা মহামারী ও ভারতের ভবিষ্যৎ

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

- ✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।
- ✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।
- ✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद हैं, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ১১ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২৭ জুলাই - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

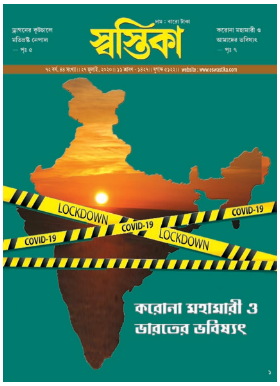

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

ড্রাগনের কূটচালে মতিভ্রষ্ট নেপাল ▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ৫

করোনা মহামারী ও আমাদের ভবিষ্যৎ

▯ অধ্যাপক উচ্ছল কুমার ভদ্র ▯ ৭

করোনা মহামারী ও ভবিষ্যতের ভারত

▯ ডা: আর এন দাস ▯ ১২

করোনা নিয়ে আপাতভয়কে দূরে সরান, ফিরবে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ▯ স্বপন দাস ▯ ১৫

করোনা থেকে বাঁচতে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনশৈলী গড়ে তুলতে হবে ▯ ডা: প্রভাত সিংহ ▯ ১৭

করোনা পরবর্তী সময়ে মানুষের মনে সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক সমস্যা ▯ ডা: উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৭

করোনা মানুষের জীবনে অনেক কিছুই অভ্যাসে পরিণত করে দেবে ভবিষ্যতে ▯ ডা: অরিন্দম বিশ্বাস ▯ ১৮

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই চীনের পতন

▯ অজয় সরকার ▯ ১৯

বাংলাদেশে বর্বরতার নতুন নজির : আহমদীয়া শিশুকে কবর থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ▯ ২১

সামাজিক মাধ্যমে ছ'কোটি অনুগামীর সংখ্যা ছুঁয়ে মোদী নতুন রেকর্ড করলেন ▯ ধর্মেন্দ্র প্রধান ▯ ২৪

জওহরলাল নেহরু ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

▯ ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ▯ ২৬

দ্বিশততম জন্মবর্ষে অক্ষয় কুমার দত্ত ▯ অনু বর্মন ▯ ২৯

বড়ো সোহাগের মা আমার ▯ সারদা সরকার ▯ ৩১

করোনা মোকাবিলায় আয়ুশ মন্ত্রকের ভূমিকা

▯ ডা: সমরজিৎ ঘটক ▯ ৩৪

আমাদের প্রেরণাস্রোত জগদেওরামজী ▯ অতুল জোগ ▯ ৩৭

তপন ঘোষ অনেক বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন

▯ ডা: রবীন্দ্রনাথ দাশ ▯ ৩৮

চিঠিপত্র : ৩৫

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আত্মনির্ভরতাই একমাত্র পথ

করোনার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির দরুন সমগ্র বিশ্ব এখন এক সামুহিক পরিবর্তনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের সর্বক্ষেত্রেই— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, অর্থনীতি সর্ববিষয়ে নূতন ভাবে চিন্তাভাবনা করিতে হইতেছে। নূতন পথে চলার সন্ধান বাহির করিতে হইতেছে। করোনা নামক এই চৈনিক ভাইরাসটি সমগ্র মানবজাতিকে আঘাত হানিয়াছে। মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। এই আক্রমণের সম্মুখে মাথানত করিয়া পরাজয় স্বীকার করা কাপুরুষতা। বরং, এই আক্রমণের মোকাবিলা করিয়া নূতন করিয়া বাঁচিবার এবং মানব সভ্যতাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করাই শ্রেয়। বিশ্বের সবকটি দেশ সেই চেষ্টাই করিতেছে এখন। সেই প্রচেষ্টা করিতে গিয়া এতদিনের চেনা এবং প্রচলিত পন্থাটির বদলে নূতন পথে চলিতে চেষ্টা করিতে হইতেছে সকলকে। সেই অর্থে বলা যায়, মানবজাতি এখন এক নূতন যুগে প্রবেশ করিতেছে। মানুষ আবার নূতনভাবে আবিষ্কার করিতেছে নিজেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও সমগ্র বিশ্ব এক বিপর্যয়ের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতেও নূতন করিয়া আমেরিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের অনেকগুলি দেশকে নূতন করিয়া রাষ্ট্র গঠনের পথে হাঁটিতে হইয়াছিল। কিন্তু করোনার আঘাত সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাত হইতেও অনেক তীব্র। একটি দেশও এই আঘাত হইতে রক্ষা পায় নাই। এই আঘাতে এতদিনের চেনা সমাজটিই সম্পূর্ণ পালটাইয়া গিয়াছে। করোনার সর্বাধিক তীব্র আঘাতটি পড়িয়াছে বিশ্ব অর্থনীতির উপর। বিশ্ব অর্থনীতিতে এক ভয়াবহ মন্দা নামিয়া আসিয়াছে। গত চার মাসে ভয়াবহ কর্মসঙ্কোচনের মুখে পড়িয়াছে সব কয়টি দেশ। ভারতও তাহার ব্যতিক্রম নহে। এই পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্বের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ, বিশ্ব অর্থনীতিকে আবার শক্তিশালী করা। মানুষকে কর্মসংস্থানের সন্ধান দেওয়া। মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা। ইতিমধ্যেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারত গঠন করিবার কথা বলিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, একমাত্র আত্মনির্ভরতাই এই সংকট হইতে আমাদের উত্তরণের পথ দেখাইতে পারে। যে কারণে প্রধানমন্ত্রী আমদানি-নির্ভরতা কমাইয়া নিজেদের দেশে উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির উপর জোর দিয়াছেন। সেই সঙ্গে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নের জন্যও কৃষিক্ষেত্রে সবিশেষ জোর দিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হইল কৃষি অর্থনীতি। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত না হইলে অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়ন যে সম্ভব নহে—তাহা প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন।

মনে রাখিতে হইবে , সংকটের সময়ই নেশন হিসাবে একটি দেশ আত্মপ্রকাশ করে। নেশন অর্থে কোনো মানচিত্র মাত্র নহে। একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত কিন্তু পাহাড় পর্বত, অরণ্য বা জনপদও নহে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, নেশন অর্থে একটি জনগোষ্ঠীর দেশগঠনের কার্যে একত্রে কর্ম করিবার ইচ্ছা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানিরা এইভাবেই একত্রে দেশগঠনের কাজ করিয়া জাপানকে নেশন হিসেবে গঠন করিয়াছিল। ইউরোপের কিছু কিছু দেশও এই নিদর্শন রাখিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতও এই সংকটের সময় নেশন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। আমাদের আশা, পরিবর্তিত এই বিশ্বে ভারত অবশ্যই নেশন হিসাবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে।

সুভাষিতম্

মুণ্ডে মুণ্ডে মতির্ভিন্না কুণ্ডে কুণ্ডে নবং পয়ঃ।

জাতৌ জাতৌ নবাচারা নবা বাণী মুখে মুখে।।

ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্কে ভিন্ন ভিন্ন মতি (ভাবনা) হয়, ভিন্ন ভিন্ন সরোবরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জল হয়, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের লোকের ভিন্ন ভিন্ন আচার-বিচার হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন মুখ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বাণী নির্গত হয়।

ড্রাগনের কূটচালে মতিভ্রষ্ট নেপাল

রঞ্জন কুমার দে

ভারত বরাবর প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সদ্‌ভাব বজায় রেখে আসছে। সার্কভুক্ত ছোট্ট দেশ — বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তানের ভারত সর্বদা এক প্রকৃত বন্ধু। ত্রাতার ভূমিকায় সচেষ্ট যেটা আমরা ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং ২০১৭ সালে ভূটানের ডোকলামে চীনের আগ্রাসনেও দেখতে পেয়েছি। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শক্তি প্রদর্শনে দক্ষিণ এশিয়ার দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ভারত-চীন পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই ভারতকে ঘিরতে চীন সার্কভুক্ত এই দেশগুলিতে বিভিন্ন খাতে অজস্র বিনিয়োগ করছে এবং পাকিস্তান চীনের বাড়তি সুবিধায় ভারতে সর্বদা জঙ্গিবাদের আক্রমণ ছড়িয়ে অসছেই। নেপাল ও ভারতকে ‘রুটি ও বেটি’র সম্বন্ধে আখ্যায়িত করা হয়। নেপালের সঙ্গে রয়েছে আমাদের ভাষ্যিক, ধার্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য। সম্ভবত সেই কারণে চীনের কুপ্রভাবে নেপালের পকেট ভর্তি করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, একমাত্র নেপালি নাগরিকদের ভারতীয়দের মতো সামরিক বাহিনী-সহ সব সরকারি ক্ষেত্রে চাকরির সুব্যবস্থা আছে, এমনকী তারা অবসেরর পরও সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন না। ‘ইবিনা পাসপোর্ট’ ভিসায় উভয় দেশের নাগরিক অবাধে বিচরণ করতে পারেন। নেপালে কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে শুরু করে ভূমিকম্প, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি আপদকালীন সমস্যায় ভারত সর্বদা উত্তম এবং সাহায্যকারী প্রতিবেশীর ভূমিকায় ছিল। উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্কের ভিত নেহরুর জমানায় শুরু হলেও ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে মনমোহন, বাজপেয়ী, মোদী সরকার ভারতের প্রত্যেকটি নির্বাচিত সরকার নেপালের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্কের পুরো পৃষ্টপোষকতা করে গেছে। কাঠমাণ্ডুতে তৎকালীন নেপালি প্রধানমন্ত্রী মোহন সমসের জং এবং ভারতের রাষ্ট্রদূত সিএনসিং-এর উপস্থিতিতে ১৯৫০ সালের ৩১ জুলাই উভয় দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ভারত-নেপাল শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি হয়। সেই সূত্র ধরে ১৯৫২ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নেপাল দখলের চেষ্টা করলে ভারত দেওয়াল হয়ে প্রতিহত করে। নেপালের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রতিবেশী ভারতের অবদান অপরিসীম। নেপালের প্রথম বিমানবন্দর প্রতিস্থাপন করা থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক, যোগাযোগ, শিল্প, বাণিজ্যে ভারত সর্বদা নেপালের পাশে থেকেছে। ২০১৫ সালের নেপালের ভয়ংকর ভূমিকম্পে ভারত ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যে সবার আগে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন নেপালকে পুনর্গঠনের সহায়তায় তৎকালীন ভারতে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ১ হাজার বিলিয়ন ডলারের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য , ভারতের বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন সীমান্তে যথেষ্ট কড়াকড়ি থাকলেও নেপাল-ভারত সীমান্তের ১৮৫০ কিমি জুড়ে তা কোনোদিনই ছিল না। ২০১৬ সালের সরকারি এক তথ্যানুসারে নেপালের প্রতিরক্ষা দপ্তরে নিয়োজিত আছেন ৯৫ হাজার নেপালি নাগরিক। তুলনামূলকভাবে ভারতের আধা-সেনাবাহিনী ও পুলিশ বিভাগ ছাড়াই শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর ৭টি গোর্খা রেজিমেন্টেই রয়েছেন ৪০ হাজার নেপালি। নেপালের প্রায় ৪০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ ভারতের অংশীদারিত্ব, ১৫০টিরও বেশি ভারতীয় সংস্থা নেপালে প্রতিষ্ঠান গড়েছে। ভারতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নেপালিরা অতি সহজে প্রবেশ করে বিনা শুল্কে সবরকম পরিষেবা উপভোগ করছে। ভারত-নেপালের মধ্যে ১৯৫১ সালের সন্ধি অনুযায়ী শুধুমাত্র নেপালের নাগরিকরা অবশ্যই ভারতে সরকারি চাকরির সুবিধা এবং জমি ক্রয় করতে পারবে কিন্তু সেই সুবিধা ভারতীয়রা নেপালে গিয়ে ভোগ করতে পারবেন না।

ড্রাগনের কূটচালে ভারত বিরোধিতায় নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে নেপাল

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে যে, অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে মিথিলা কন্যা সীতা দেবী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সুতরাং নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শুধু প্রতিবেশীর নয়, বরং পরম আত্মীয়তার। কিন্তু চীনের কূটচালে নেপালি কমিউনিস্ট প্রধানমন্ত্রী ওলির নেতৃত্বে সম্প্রীতির সেই সম্পর্কে অনেকটা ফাটল ধরেছে। চীনের পরোক্ষ মদতে নেপাল উভয় কক্ষে বিল পাশ করে উত্তরাখণ্ডের তিনটা এলাকা কালাপানি, লিপুলেখ ও

লিংপিরাধুরা তাঁদের মানচিত্রের নকশায় সংযোজিত করেছে। নেপালের কামিউনিস্ট সরকার সম্প্রতি এতোই ভারত বিদ্বেষী হয়ে পড়েছে যে মহামারী করোনার জন্য তারা ভারতকেই দায়ী করেছে। ভারত-নেপাল সীমান্তের রেডিয়ো চ্যানেলগুলিতে চলছে অবিরত ভারত বিরোধী প্রচার। নতুন মানচিত্রের নকশার দোহাই দিয়ে নেপাল ভারতের তিনটি গ্রাম যথাক্রমে গোঞ্জী, নাবী ও কুটিরের প্রায় ৩ হাজার ভারতীয়ের জবরদস্তি নেপালি নাগরিকত্ব নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে । সম্ভবত এই প্রথম চাপা উত্তেজনার মধ্যে নেপালের সুরক্ষাকর্মী এক ভারতীয়কে গুলি করে, কয়েকজন আহত হয়। নেপালের গৃহমন্ত্রণালয় ভারত-নেপাল সীমান্তে বর্তমানে ১০০টি অতিরিক্ত চেকপোস্ট স্থাপন করে সেই সংখ্যা ১২১ থেকে লাফিয়ে ২২১টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সেই সংখ্যা আগামীতে ৫০০-তে পৌঁছনোর টার্গেট নিয়ে নেপাল সরকার ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ভারত-নেপাল সংঘাতের সুত্রপাত ঘটে যখন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ গত ৮ মে উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ গিরিপথ থেকে কৈলাশ মানস সরোবর যাওয়ার ৮০ কিমি লম্বা সড়কের উদ্ঘাটন করেছিলেন। নেপাল উত্তরাখণ্ডের তিনটে এলাকার পর আবার বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার জমিও তাদের বলতে দাবি শুরু করে দিয়েছে। এলাকাটির উভয় দেশের সীমা নির্ধারক পিলার নম্বর ৩৪৫/৫ ও ৩৪৫/৭-এর ৫০০ মিটার এলাকা জুড়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্য বিহারের গণ্ডক নদীর বাঁধ নির্মাণে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য যে ১৯৫৪ সালের কুশি সন্ধি এবং ১৯৫৯ সালের গণ্ডক সন্ধিনুসারে ভারত-নেপাল উভয় সীমান্ত এলাকায় নদীবাঁধ মেরামতি প্রকল্প অত্যন্ত সৌহার্দরূপে হয়ে আসছিল। নেপালের বর্তমান ওলি সরকার নাগরিকত্ব আইনে ২০৬৩ সংশোধনী এনে এখন সেখানকার ভারতীয় বধূদের নাগরিকত্বের জন্য ন্যূনতম ৭ বছরের করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্বের আইন পরিত্যাগ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ক্রমাগত ভারত বিরোধী অ্যাজেন্ডার সঙ্গে সমন্বয় রেখে এখন নেপালের অন্যতম সরকারি ভাষা হিন্দিকে নিষেধাজ্ঞার পথে হাঁটছেন। উল্লেখ্য , হিন্দি নেপালের অন্যতম জনপ্রিয় প্রথম ভাষা। ২০১১ সালের জনগণনানুসারে শুধুমাত্র সীমান্ত এলাকায় প্রায় ৭৮ হাজার হিন্দি ভাষাভাষীর বাস। এটা পুরো স্পষ্ট যে, হিন্দিতে নিষেধাজ্ঞা কেবল ভারকের প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তবে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করে নেপাল মোটেই ভালো নেই। সেখানে নিত্যসামগ্রীর আকাশছোঁয়া দাম। লবণের কেজি প্রতি দাম হয়েছে ১০০ টাকা, প্রতি লিটার সরিষা তেল ২৫০ টাকা, চিনি ১২৫ টাকা, ঢেঁরস ১০০ টাকা, আলু ৯০ টাকা কিলোতে পৌঁছে গেছে। প্রধানমন্ত্রী ওলি প্রকৃতপক্ষে নিজের দেশের নাগরিকদেরই খাদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।

চীন ক্রমশ নেপালের জমি হাতিয়ে নিচ্ছে। সেই বিফলতা ধামাচাপা দিতেই নেপাল সরকার ভারত বিরোধী ইস্যুগুলিতে কৃত্রিম জাতীয়তাবাদের প্রলাপ বকছে। নেপালের কয়েকটা সংবাদমাধ্যমের সূত্রানুসারে চীন নেপালের গোর্খা জেলার রুইগ্রাম দখল করে ৭২টি পরিবারকে চীনের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। রুইগ্রাম ছাড়াও চীন নেপালের আরও ১১টি এলাকা জবরদখল করে মোট চার জেলার প্রায় ৩৬ হেক্টর জমি হাতিয়ে নিয়েছে। ১৮১৬ সালের সুগৌলি সন্ধির সূত্রানুসারে নেপাল ভারতের লিম্পিয়াধুরা, কালাপানি, লিপুলেখ নিজেদের মানচিত্রের নকশায় দাবি করলেও ১৯৬০-এর দশক থেকে তাদের দেশের উত্তরী গোরখার রুইগাঁও এবং উত্তরী সংকুয়াসভার চয়াং, লুংগডেক গাঁও চীনের অধিকৃত। চীন-নেপাল সীমান্তের ১৪১৪.৮৮ কিমি সীমান্তের ৯৮টি পিলার ভেঙে চীন অনেক জমি কবজা করার অভিযোগ করেছে নেপালি সংবাদমাধ্যম। খোদ নেপাল কৃষিমন্ত্রকের অধীনস্ত জরিপ অনুযায়ী চীন কয়েক হেক্টর জমি দখল করা ছাড়াও এখন তারা নদীর গথিপথ পরিবর্তন করে নোপালকে ক্রমশ গ্রাস করার উপক্রম। নেপালের অভ্যন্তরীণ আশঙ্কা এই যে এভাবে ভূমি অধিগ্রহণ চলতে থাকলে এই সমস্ত অধিকৃত অঞ্চলে ভবিষ্যতে চীন সশস্ত্র পুলিশ ছাউনি বসিয়ে নেপালের জন্য আরও হুমকিস্বরূপ হতে পারে। উল্লেখ্য যে, চীনের তিব্বত থেকে নেপালের দিকে প্রবাহিত সুমজং, কামখোলা ও অরুণ নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়ায় নেপালের সংস্কুয়াসভা জেলায় জলের চরম ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে।

নেপাল চীনের প্রতি ঝুঁকলেও চীনের সীমান্ত এলাকায় অধিকাংশ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক মোটেই ভালো নেই। চীন সুযোগমতো কত ভয়ংকর হতে পারে সেটা বর্তমান নেপালের ওলি সরকার মোটেই অনুধাবন করতে পারছে না। চীন ভূখণ্ডের হিসেবে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। সেই অনুসারে উত্তর কেরিয়া,রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, ভারত, ভুটান, নেপাল, ভিয়েতনাম-সহ ১৪টি দেশের সঙ্গে চীনের সীমান্ত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেই জমি, নদী, সমুদ্র, পাহাড় কিংবা পর্বতশৃঙ্গে চীন দাদাগিরিতে কোনো না সময় অস্থিরতায় মেতে উঠে। চীন পাকিস্তান, নেপালের মতো সুযোগ-সন্ধানী দেশগুলিকে অপব্যবহার করে নিজের স্বার্থ পূর্ণ করতে থাকে। চীন অতিক্রমণ, পেট্রোলিং, আর্থিক অনুদান প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিবেশীর ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় সচেষ্ট থাকে। ২০১৭ সালে চীনের ডোকলাম বিবাদে ভারত প্রতেবশী বন্ধুদেশ ভুটনের হয়ে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরপরও ভুটানের চারাগাহ অঞ্চলে চীন নজর রেখে আসছে। সম্প্রতি নেপালের সরকারি দপ্তরও অভিযোগ করেছে যে চীন নদীর স্রোত পরিবর্তন করেছে। তাদের সঙ্গেও সীমান্ত বিবাদ লেগেই আছে। তাইওয়ানকে চীন দীর্ঘ সময় থেকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে আসছে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সড়ক, দ্বীপ কিংবা সমুদ্র এলাকার আধিপত্য নিয়ে চীন বিতর্কে জড়িয়ে রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সুসম্পর্ক থাকলেও ১৯৬৩ সালে উভয় দেশের সীমানা সমঝোতায় পাকিস্তান শকসগাম ঘাঁটির একটি বড়ো এলাকা চীনের কাছে সমর্পণ করে। সম্প্রতি হংকংয়ে আগ্রাসী মনোভাব এবং সেখানকার 'মৌলিক অধিকার' ও 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' লঙ্ঘনের অভিযোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘ চীনের প্রতি ক্ষেভে ব্যক্ত করেছে, এমনবস্থায় নেপালের মতো দুর্বল ক্ষুদ্র দেশ চীনের কাছে কতটুকু নিরাপদ! অন্যদিকে ভারত সার্কভুক্ত প্রায় প্রতিটি দেশকে (পাকিস্তান ছাড়া) আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক নিরাপত্তা দিয়েই আসছে। স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, মিত্র দেশ নেপাল ড্রাগনের কূটচালে ভারত বিরোধিতায় নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে না তো! ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

করোনা মহামারী ও আমাদের ভবিষ্যৎ

অধ্যাপক উচ্ছল কুমার ভদ্র

উন্মেষ :

ল্যানসেট জার্নালে ১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত রিপোর্ট বাদেও অন্যান্য সূত্র মারফত, যার মধ্যে চীনের উহান প্রদেশ থেকে আসা রিপোর্টও রয়েছে, তাতে জানা যায় যে, উহান প্রদেশে নতুন এক করোনা ভাইরাস ছড়াতে আরম্ভ করেছে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে বা তার আগে থেকেই। এই 'নতুন' ভাইরাসের উদ্ভব সম্পর্কে যে দুটো তত্ত্ব রয়েছে। তার প্রথমটি হলো : এটি প্রাণীদেহে অন্যান্য ভাইরাসের মধ্যে জিনগত আদান-প্রদান হয়ে উৎপন্ন নতুন প্রজাতির এক ভাইরাস, যা মানুষের দেহেও বংশবিস্তার করতে পারে (এমন ঘটনা প্রাণীদেহে হামেশাই ঘটছে, কিন্তু উৎপন্ন বহু প্রজাতির মধ্যে হাতে গোণা যে ক'টি প্রাণী ও মানবদেহ দু' জায়গাতেই বংশবিস্তার করতে পারে, তারাই অসুখের উৎপত্তি করে)। আর, দ্বিতীয় তত্ত্বটি হলো : এই ভাইরাস চীন তার উহান প্রদেশে অবস্থিত জৈবাস্ত্র গবেষণাগারে জিনগত গবেষণায় তৈরি করেছে এবং দুর্ঘটনায় বা ইচ্ছাকৃত কারণে এটি বেরিয়ে পড়ে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ.এইচ.ও.)-র বেইজিং অফিসে নতুন এক সংক্রামক অসুখের খবর পৌঁছায় এবং তার পরদিন (অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর) তাইওয়ানের স্বাস্থ্যমন্ত্রক ডব্লিউ.এইচ.ও.-কে এই খবর জানায়। চীন নিজে ডব্লিউ.এইচ.ও.-কে সরকারিভাবে বিষয়টা জানায় ৩ জানুয়ারি।

করোনা-ভবিষ্যতের নিয়ামক :

এই মহামারীর ভবিষ্যৎ স্বরূপ নির্দিষ্ট হবে নতুন করোনা ভাইরাস (যার পরবর্তীকালে নামকরণ হয়েছে কোভিড-১৯)-এর জৈবিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই শুধু নয়, সংশ্লিষ্ট আর্থ- সামাজিক-রাজনৈতিক কার্য- কারণে ও তার অভিঘাতের দ্বারাও বটে।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনও জরুরি ঘটনা ঘটলে তার রিপোর্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রচার করতে হয়। চীন তা তো করেইনি, বরং ডব্লিউ.এইচ.ও. নিজেও ব্যাপারটা জানত, তবুও চুপচাপ ছিল। তাইওয়ানের স্বাস্থ্য মন্ত্রক ডব্লিউ.এইচ.ও.-কে এই নতুন অসুখের মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণের কথা জানালেও, ডব্লিউ.এইচ.ও. কিন্তু নড়ে চড়ে বসেনি। চীন ওই ভাইরাসের জিনগত বিশ্লেষণ ৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখেই করে ফেলেছিল বলে সাংহাই পাবলিক হেলথ ক্লিনিক সেন্টারের ড. ঝাং যোঙ্গয়েন জানিয়েছেন, কিন্তু চীন ওই বিশ্লেষণ প্রকাশ করছে না দেখে তিনি নিজেই সেটা ১১ জানুয়ারি ইন্টারনেটে প্রকাশ করে দেন। পরদিনই চীনা পুলিশ তাঁর ল্যাবরেটরি বন্ধ করে দেয়। ১৪ জানুয়ারি ডব্লিউ.এইচ.ও. স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিবৃতি দিয়ে জানায় : 'চীন সরকার জানিয়েছে নতুন করোনা ভাইরাসটি মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় না'। বিবৃতিটি উহান থেকে আসতে থাকা অন্যান্য রিপোর্টের নিরিখে অসত্য। ডব্লিউ.এইচ.ও. চীনকে স্বস্তি দিল ২২ জানুয়ারি একটা বিবৃতি দিয়ে : 'নতুন অসুখটি আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ নয়' এবং ২৮ জানুয়ারি আরও একটা বিবৃতি দিতে বাধ্য হলো : 'নতুন অসুখটির বিষয়ে

আন্তর্জাতিক স্তরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হচ্ছে।' ডব্লিউ.এইচ.ও. চীনকে সাধুবাদ দিয়েছিল দেশের আন্তরাজ্য উড়ান বন্ধ করে দেবার জন্য, কিন্তু যখন অন্যান্য দেশ চীন থেকে আসা উড়ান বন্ধ করতে চাইল, তখন আপত্তি জানিয়েছিল। ওই আপত্তি অগ্রাহ্য করে আমেরিকা চীনের উড়ান বন্ধ করে দেওয়ায় ডব্লিউ.এইচ.ও. ৩ ফেব্রুয়ারি বিবৃতি দিল : 'চীন পৃথিবীকে বাঁচানোর যথেষ্ট চেষ্টা করছে, তাই এখন উড়ান বন্ধ হওয়ায় লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।' অবশ্য ততদিনে পৃথিবী জেনে গেছে যে, চীন কর্তৃপক্ষ উহান লকডাউন করার আগে পঞ্চাশ লক্ষ লোককে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যেতে দিয়েছে। এই ধরনের আরও অনেক আজব ঘটনার পর ডব্লিউ.এইচ.ও. যখন শেষ পর্যন্ত ১১ মার্চ অসুখটাকে বিশ্ব-মহামারী বলে ঘোষণা করল, ততদিনে বিশ্বের ১১৪টি দেশে ৪০০০ মানুষের মৃত্যু ও লক্ষাধিক অসুস্থ হয়ে গেছেন।

এই কথাগুলো জানা দরকার, কারণ কমিউনিস্ট চীন এবং তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থা ডব্লিউ.এইচ.ও. যদি সত্যি ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সময়মতো সবাইকে জানাতো তাহলে পৃথিবী অনেকটাই সময় পেতো এবং এই মহামারী হয়তো একটু অন্যরকম হতে পারতো।

সমগ্র পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসের উৎপাদক ও প্রসারক হিসেবে চিহ্নিত হবার পর চীনের আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের পরিচয় আমরা এর মধ্যেই পেয়েছি। চীন দাবি করেছে এভারেস্ট পর্বত তাদের, ভুটানের কিছু অংশ তাদের, ভারতের লাদাখের একটা অংশ তাদের, রাশিয়ার কিছু অংশ তাদের। এছাড়া নেপালকে উসকে চরম ভারত-বিরোধী অবস্থানে নিয়ে এসেছে। চীনের সঙ্গে লাদাখ সীমান্তে ভারতের ছোটো সামরিক সংঘর্ষ, ভারতের অত্যাবশ্যক সমর সজ্জা এবং প্রতিরক্ষা খাতে তাৎক্ষণিক বিপুল ব্যয়, যা এই মহামারী-জনিত রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সংকোচনের সময় অতিরিক্ত চাপের কারণ হয়েছে, তা চীন জেনে বুঝেই ঠিক এই সময়ে করিয়েছে। এরই মধ্যে আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের তিনটে বিমানবাহী পারমাণবিক যুদ্ধজাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে 'আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা' বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এসে পৌঁছানো যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। এতে সন্দেহ নেই যে, করোনা পরবর্তী বিশ্বে আর্থ-সামাজিক ও সমরশক্তি বিষয়ক এক নতুন মেরুকরণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও আস্তে আস্তে আর একটি বিষয় ক্রমশ প্রকট হয়ে চলেছে। মহামারীর নিঃশব্দ ও দ্রুত প্রসারের ফলে একসঙ্গে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দেশে দেশে এক অভাবনীয় স্বাস্থ্য-আর্থ- সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান এক আতঙ্কের পরিবেশকে লালন ও হাতিয়ার করে এমন এক অসাধু ব্যবসায়িক বাতাবরণ চারপাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, যার ফল যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী হবে বলেই আভাস পাওয়া যায়।

সংক্রমণের গতি ও পরিসংখ্যানের ব্যাখ্যা :

চীনের বাইরে কোভিড-১৯-এর প্রথম রুগিটি পাওয়া গেল ১৩ জানুয়ারি থাইল্যান্ডে। এই লেখার সময় সারা পৃথিবীতে প্রায় পনেরো কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন, মারা গেছেন ছ' লক্ষেরও বেশি মানুষ। ভারতে এই আক্রান্তের সংখ্যা দশ লক্ষ ছাড়িয়েছে, মৃত্যু প্রায় সাতাশ হাজার। এই বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে, কোভিড-১৯ রোগ-নির্ণয় করার যে পরীক্ষাটি রয়েছে, যাকে আরটি-পিসিআর বলা হয়। সেই পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত মানুষই রুগি বলে সব্যস্ত হন এবং ওই পরিসংখ্যানে স্থান পান। সমস্ত রুগিরই এই পরীক্ষা করার সুযোগ নেই বা করা হয় না। বলাই বাহুল্য, এই ভাইরাস যাঁদের দেহে সংক্রামিত হয়, তাঁদের একটা অংশের কোনও উপসর্গই হয় না; তাঁরা সংক্রমণ ছড়াতে থাকেন, কিন্তু তাঁদের টেস্ট না হবার ফলে তাঁরা পরিসংখ্যানে আসেন না। আরও একটি অংশের খুবই মৃদু, অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণস্থায়ী উপসর্গ হয় (যেমন, একটু গলাব্যথা বা একটু জ্বর জ্বর ভাব বা একবার হঠাৎ পাতলা পায়খানা, একবেলা একটু কাশি ইত্যাদি), তাঁরা কোভিড-১৯ হয়েছে এমন সন্দেহ করেনই না, ফলে এদেরও টেস্টও হয় না। এই উপসর্গ বিহীন কিংবা মৃদু উপসর্গ যুক্ত মানুষের সংখ্যা কত? ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিক্যাল রিসার্চে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে দেখা গেছে গবেষকরা ২২ জানুয়ারি এবং ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ১,০২১, ৫১৮ জন মানুষকে টেস্ট করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৪০,১৮৪ জনের দেহে কোভিড-১৯ সংক্রমণের অস্তিত্ব পেয়েছেন। এদের মধ্যে উপসর্গ বিহীন মানুষের অনুপাত ২৮ শতাংশ। আমরা জানি যে, এর সঙ্গে মৃদু উপসর্গযুক্ত রুগিদের ধরলে অনুপাতটা সারা দেশে প্রায় ৭০ শতাংশ হতে পারে। এতে করে বোঝা গেল যে, রুগির যে দৈনিক পরিসংখ্যান আমরা দেখি, যা নিয়ে মিডিয়া রোজ চিৎকার-চেঁচামেচি করে আতঙ্ক বাড়ানোর চেষ্টা করে, সেটি আসলে মোট সংক্রমণের একটি ছোট্ট অংশ। যার অর্থ হচ্ছে কতজন মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে অসুস্থতা অনুভব করে ডাক্তার দেখিয়ে ডাক্তারের নির্দেশমতো টেস্ট করিয়েছেন, কিংবা অন্য কোনো পজিটিভ কেসের সংস্পর্শে এসেছেন বলে তাঁর টেস্ট করা হয়েছে। দেশে আসল সংক্রমণের পরিমাণ দৈনিক সম্প্রচারিত সংখ্যার অনেক বেশি। এই কথা শুনে আতঙ্কগ্রস্ত হবার কারণ নেই দুটো কারণে : এক, এতে স্পষ্ট বোঝা গেল বেশিরভাগ মানুষের লক্ষণ, উপসর্গ তেমন হয় না, তাঁরা ভালো হয়ে যান, ভালোই থাকেন। দুই, ১৩৩ কোটি মানুষের দেশ ভারতে এই সংক্রমণের পরিমাণটা আসলে বেশি উপদ্রুত অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্টই কম। যেমন, প্রতি লক্ষ জনসংখ্যার হিসেবে কোভিড-১৯ রুগি আমেরিকায় ১১৪৭ জন, ব্রেজিলে ৯৬৬ জন, কিন্তু ভারতে সংখ্যাটা প্রতি লক্ষে ৭৬ জন। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তাই। প্রতি লক্ষের হিসেবে মৃত্যু আমেরিকায় ৪৩, ব্রেজিলে ৩৬.৭ ও ভারতে ১.৯। এতেও আবার বেশি নির্বিকার থাকার দরকার নেই, কেননা যত কমই হোক, সংক্রমণ ছড়ানো তো রোধ করতেই হবে, কারণ যাঁর মধ্যে রোগ ছড়াবে তাঁর যে বাড়াবাড়ি হবে না, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই।

প্রতিরোধ ও নিবারণমূলক ব্যবস্থা :

(১) লকডাউন :

লকডাউন হচ্ছে বাহ্যিক জনজীবন স্তব্ধ করে এই ভাইরাসের সংক্রমণের অগ্রগতি রোধ করা। এটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে

করে মানুষ বেশি সংখ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়ে তথা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে না তোলেন। এবং সরকার সময় পান সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবা সংহত করে তার সুষম ব্যবহার করার। ভারতে লকডাউন শুরু হয় ২২ মার্চ ২০২০। তারপর দফায় দফায় লকডাউনের মাধ্যমে এই মহামারীর মোকাবিলা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ভারতের একমাত্র রাজ্য, যেখানে লকডাউন শুরু হতেই মুখ্যমন্ত্রী দলবল নিয়ে সারা কলকাতা চষে বেড়িয়ে বাজারে রাস্তায় রাস্তায় গোল্লা এঁকেছেন মানুষ ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে বাজার করবেন তা বোঝাতে, আর মানুষ ভিড় করে কৌতূহলের সঙ্গে সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করেছেন। লকডাউনের মতো এমন একটি জরুরি ও অবশ্যপালীয় বিষয়কে দিনের পর দিন এইরকম খেলো করে দেবার ফলশ্রুতি এই হয়েছে যে, রাজ্যের মানুষ লকডাউন বিষয়টা আদপেই গুরুত্বের সঙ্গে নিতে পারেননি এবং কার্যত ব্যর্থই করে দিয়েছেন। এ সত্ত্বেও লকডাউনের অবশ্যম্ভাবী সুফল হিসেবে সারা দেশে সংক্রমণ যা হতে পারত, অবশ্যই তার চেয়ে প্রত্যাশিতভাবেই যথেষ্ট কম হয়েছে। এছাড়া যা যা লক্ষ্য করা গেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন— মানুষ ঘরমুখো হয়েছে, পরিবারমুখো হয়েছে, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে, সংক্রমণরোধী বিশেষ বিশেষ পুষ্টিগুণবিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের দিকে মানুষের ঝোঁক দেখা গেছে। যেমন, শাকসবজি, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ডি ইত্যাদি। শরীরের যত্ন নেওয়া তথা শরীরচর্চার বিষয়টি সক্রিয় করণীয় তালিকায় উঠে এসেছে। ঘরের বহু কাজে জড়িয়ে মহিলাদের সংসারচর্চার হাজারো কাজ পুরুষের নজরে এসেছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। মানুষ ঘরে ঢুকে পড়ায় প্রকৃতির ওপর মানুষের যে স্বেচ্ছাচারিতা ছিল তা প্রায় সম্পূর্ণই অন্তর্হিত হবার ফলে আকাশ ধোঁয়াশা বিহীন, বাতাস নির্মলতর, এক কথায় প্রকৃতির নতুনের মতনই ঝকঝক করতে শুরু করেছে। মানুষ আবার নতুন করে বুঝেছে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে কী পরিমাণ কলুষিত করা হয়েছিল। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর এক বিশেষ প্রকৃতিবান্ধব পদক্ষেপ সবার নজর কেড়েছে ও অভিবাদন আদায় করে নিয়েছে। তিনি ১০ জুলাই শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের রেওয়াতে এক মহতী ৭৫০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট ও এশিয়ার সর্ববৃহৎ সৌরশক্তি প্রকল্প উদ্বোধন করলেন। পরিবেশ দূষণকারী ফসিলজাত বা পারমাণবিক শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা ধাপে ধাপে কমিয়ে সবুজতর অপ্রচলিত শক্তির সন্ধানে আমাদের এই প্রকল্প।

প্রতিরোধ ও নিবারণমূলক ব্যবস্থা : ব্যক্তিগত সুরক্ষা :

ব্যক্তিগত সুরক্ষা তিন ধরনের : মাস্ক ব্যবহার, সাবান-জল (বা তা না থাকলে স্যানিটাইজার) দিয়ে কনুই অবধি ঘনঘন হাত ধোঁওয়া এবং পরিবারের বাইরে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ছ' ফুট দূরত্ব বজায় রাখা। জাপানে বহু বছর ধরেই মাস্কের প্রচলন আছে। সেদেশে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ মানুষ বাড়ির বাইরে মাস্ক ব্যবহার করেন। তাঁদের কাছে সেটা ভদ্রতা। তাঁরা মনে করেন, কথা বলার সময় যে সূক্ষ্ম অদৃশ্য থুথুকণা মুখ থেকে বের হয়, তা থেকে অপরকে রক্ষা করা প্রাথমিক কর্তব্য। করোনা ভাইরাস এসে পৃথিবীর সবাইকে মুখে মাস্ক পরতে বাধ্য করেছে। সম্প্রতি জানা গেছে, ভাইরাসটি বাতাসে বেশ কিছুক্ষণ ভেসে থাকতে পারে। বদ্ধ জায়গায় এটা একটা বড়ো সমস্যা। আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোলের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সবাই যদি মাস্কের ব্যবহারে নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক হতে পারেন, তবে সামনের দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে এই বর্তমান মহামারীটি আয়ত্তে এসে যাবে। নেপালে মাস্ক ছাড়া কাউকে রাস্তায় দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ৫০০ টাকা জরিমানা নেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য করোনা ভাইরাস আগেও এসেছিল (সার্স ভাইরাস, মার্স ভাইরাস), আবারও আসবে। মনে হচ্ছে মাস্ক আমাদের সবার মুখে পাকাপাকি ভাবেই জায়গা করে নিল।

প্রতিরোধ ও নিবারণমূলক ব্যবস্থা : চিকিৎসা :

পর্যবেক্ষণ-১

এক গবেষক তরুণীর একটু গলাব্যথা, কাশি হওয়াতে ডাক্তার দেখানো হলো। তিনি রক্ত পরীক্ষা করার জন্য বাবার সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার এক নামী ল্যাবরেটরিতে গিয়ে রক্ত দিলেন। তারা বলল কোভিড টেস্টও করে দেবে। রিপোর্ট আনার দিন ল্যাব থেকে তাঁদের ফোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে রিপোর্ট দিল, ওই করোনার রিপোর্ট বাদে; বলা হলো অপেক্ষা করতে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাইরে থেকে একজন লোক ঢুকলো, ঢুকে তাঁর হাতে একটা কাগজ দিল। খুলে দেখেন, মেয়ের করোনার রিপোর্ট পজিটিভ। দেখেই তিনি দৌড়লেন আই-ডি হাসপাতালে। কিন্তু আই-ডি-র ডাক্তার করোনার রিপোর্ট দেখে বললেন : ''এই ল্যাবের তো সরকারি লিস্টে নামই নেই। এই কাগজ হায়দরাবাদের এক লেটারহেডে টাইপ করা। রুগির লক্ষণ উপসর্গ তেমন কিছুই নেই। প্রেসক্রিপশান করে দিচ্ছি, আপনারা একে বাড়ি নিয়ে যান। এখানে ভর্তি করলে সরকারি করোনা লিস্টে নাম উঠবে। তাছাড়া অন্যান্য রুগির সঙ্গে থাকার ব্যাপার রয়েছে।'' ভদ্রলোক ভয়ে ভর্তিই করে দিলেন। এরপর সরকারি রিপোর্ট নেগেটিভ এল।

বুঝতে পারছেন কি— একটা সুনিপুণ দুষ্টচক্র চলছে? চমৎকার ও সহজ ব্যবসা। মুম্বইয়ের এক নামকরা হাসপাতালের সাম্প্রতিক ঘটনা এই দুষ্টচক্রের আর এক প্রমাণ। সেই হাসপাতালে ভুয়ো পজিটিভ রিপোর্ট দেখিয়ে রুগি ভর্তি করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিল করা হতো। সুতরাং সাধু সাবধান!

পর্যবেক্ষণ-২

তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে ছটফট করতে থাকা ১৮ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া কোভিড পজিটিভ শুভ্রজ্যোতিকে নিয়ে সকাল থেকে চার-চারটে হাসপাতালে ঘুরে জায়গা পাননি তার মা-বাবা। শেষে মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর মা আত্মহত্যা করার হুমকি দিতে ভর্তি করা হলো ছেলেকে। তখন তাঁরা দেখলেন অন্তত তিনটে বেড খালি। শুভ্রজ্যোতি মারা গেল কয়েক ঘণ্টা পরেই।

সঙ্গত ভাবেই রাজনৈতিক তো বটেই, স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক প্রশ্ন উঠে আসে। সে কি বিনা চিকিৎসায় মারা গেল? আমরা জানি, আইসিএমআর-এর কোভিড চিকিৎসার নিয়মাবলীতে অসুখের প্রথম দিকে প্রযোজ্য

যে ওযুধটির নাম রয়েছে, সেটি হচ্ছে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে এই ওযুধটি দেওয়া হয় জিঙ্কের সঙ্গে, কারণ সব ডাক্তারই এটা জানেন যে, জিঙ্ক অণুর মাধ্যমেই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন প্রাণীকোষের করোনা ভাইরাসকে হত্যা করে। উপসর্গ শুরু হবার প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করা গেলে বেশিরভাগ রুগিই ভালো হয়ে ওঠেন। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে কি এই চিকিৎসা নিয়ম করে চলে? সর্বত্র ঠিকঠাক চলে বলে মনে তো হয় না! মনে না হওয়ার কারণ এই যে, এই নতুন অসুখে নতুন ওযুধ এনে বাজারে চড়া দামে ছেড়ে বিপুল মুনাফা করার যে এক সুবর্ণ সুযোগ এসেছে, তার ফায়দা তোলার জন্য ওযুধ কোম্পানির এক লবি অতীব সক্রিয়, এই ডিজিট্যাল মিডিয়ার যুগে এই সমস্ত তথ্য লুকিয়ে রাখা যায়নি। ওই লবি এবং দেশে দেশে তাদের পোষ্যরা বলে বেড়াচ্ছে যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নাকি এক অপদার্থ ওযুধ এবং এর সাঙ্ঘাতিক সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে, এটা নাকি হৃদযন্ত্রের পক্ষে খুব খারাপ। অথচ এর মূল ওযুধ— ক্লোরোকুইন, বিগত ৬৫ বছর ধরে ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন বাতের (রিউম্যাটয়েড আর্থরাইটিস) ওযুধ হিসেবে গত পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যবহার করছেন চিকিৎসকরা এবং কয়েক কোটি বয়স্ক বাতরোগগ্রস্ত মানুষ এই ওযুধটি বছরের পর বছর ধরে রোজ খেয়ে এসেছেন। ওযুধটি ডব্লিউ.এইচ.ও.-র জরুরি ওষুধের তালিকায়ও রয়েছে। আমরা দুঃখে লজ্জায় অধোবদন হয়ে যাই যখন দেখি বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় সাময়িকপত্র 'দ্য ল্যানসেট'-এর পাতায় হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের দোষাবলী সম্পর্কে ভুয়ো গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই এর জাল তথ্যাদি নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে এত শোরগোল ওঠে যে গবেষণাপত্রটি বাতিল বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু তবুও হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনকে কালিমালিপ্ত করার এই যুদ্ধ ভালোভাবেই জারি রয়েছে। কারণ বর্তমান বিশ্ব-মহামারীর পরিস্থিতিতে এই দশ টাকার ট্যাবলেট বাতিল করে সারা পৃথিবীতে প্রতি সিসি পিছু পাঁচ হাজার টাকা (কালোবাজারে পনেরো-কুড়ি হাজার টাকা) দামের ওযুধ চালু করে দেওয়া গেলে মুনাফা কয়েক হাজার কোটি ডলার! ভারতে এই অসাধু ব্যবসা আর সাধারণ মানুষ— এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেই একটিই মানুষ— নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। সেই কারণেই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের নাম আইসিএমআর- এর কোভিড চিকিৎসার নির্দেশাবলী থেকে বাদ দেওয়া যায়নি। কিন্তু মোদীজী তো আর বারাসাতের মিডল্যান্ড নার্সিং হোমে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন না, আপনারা তো শুভ্রজিতের কোভিড পরীক্ষা করে পজিটিভ বললেন, কিন্তু তাকে রেফার করে দেবার আগে চিকিৎসার একটা প্রেসক্রিপশন করে দিলেন না কেন? কিংবা সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ তাকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে দেবার আগে আইসিএমআর প্রোটোকল মেনে চিকিৎসাটা দিয়ে দিল না কেন?

কেন দেবে? ডাক্তারদের মনে তো নিপুণভাবে অনিশ্চয়তার বীজ রোপণ করে দেওয়া হয়েছে। আর অনেকেরই কাছে আবার বাণিজ্যের হাতছানিও যে আছে! এই অনিশ্চয়তা আজ সৃষ্টি করেছে চিকিৎসা-বিভ্রাট। চিকিৎসা-বিভ্রাট সৃষ্টি করছে একদিকে সংক্রমণের দ্রুত প্রসার এবং জনমানসে তীব্র আতঙ্ক। ওই তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করছে ঘটি-বাটি বিক্রি করে হাসপাতালে লক্ষ লক্ষ টাকার করোনা-প্যাকেজ কিনে ভর্তি হবার হুড়োহুড়ি। বেসরকারি হাসপাতালে করোনা প্যাকেজ দশ থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা। সরকারি হাসপাতালে? সঠিক জায়গাটা ধরতে পারলে একটু কমেই হয়ে যাবে। কিন্তু ওই চিকিৎসা-বিভ্রাট থেকে যাবার সম্ভাবনা প্রবল, যে বালাই বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে নেই। দামি ওযুধটা প্যাকেজেই ধরা থাকে। শুভ্রজিতের মা টাকা নেই বলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে ছেলেকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করেছিলেন। তাও যদি বুঝতাম ওই দামি ওযুধ সত্যি সত্যি কাজের হতো। ওই ওযুধ মৃত্যুর সম্ভাবনা আদৌ কমায় না (অর্থাৎ তার মরটালিটি বেনিফিট নেই)। রুগির যকৃৎ (লিভার)-এর ক্ষতি করে। কিন্তু নোংরা অসাধু বাণিজ্যের কাছে এতে কিছু এসে যায় না।

একটা জরুরি বিষয় আছে। বর্তমান সরকারি নীতি হচ্ছে উপসর্গহীন অথবা মৃদু উপসর্গ বিশিষ্ট কোভিড টেস্ট পজিটিভ রুগিদের বাড়িতেই রেখে চিকিৎসা। এর কারণ হচ্ছে রুগির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের বেডের ঘাটতি বেশি করে প্রকট হচ্ছে। এই পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবেই আরও অনেক খারাপ হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে মানুষের ভোগান্তি, হাহাকার এবং বেড পাইয়ে দেবার দুষ্টচক্রগুলোর কার্যকলাপ। কোভিড-১৯ রোগটি অতি দ্রুত সংক্রমণশীল, একে থামানো না হলে ১৩৩ কোটি ভারতবাসীকে সংক্রমিত না করে থামবে না। একে থামানোর উপায়গুলো হচ্ছে :

(১) লকডাউন। এতে ভাইরাসের অগ্রগতি রোধ করা যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের রুজিরোজগারে এবং দেশের অর্থনীতিতে অনভিপ্রেত অভিঘাত আসে। তাই এটি একদমই সাময়িক। লকডাউন উঠলে আবার মহামারী চলতেই থাকে।

(২) চিকিৎসা : কোভিড-১৯-এর চিকিৎসা হিসেবে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে, তার আলোচনা করা হয়েছে। এটিকে শক্ত হাতে রোখা দরকার। আর একটি বিষয় হচ্ছে, দেশের এখনও নীতি রয়েছে টেস্ট করে পজিটিভ না পেলে চিকিৎসা করা হবে না। এই নীতির পরিমার্জন অবশ্যই করতে হবে। কেননা যতই এই ভাইরাসটির বিভিন্ন দিক ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে, আমরাও তেমন তেমন ব্যবস্থা নিচ্ছি। এই টেস্টগুলো এখনও সহজলভ্য নয়, এখনও সুলভ বা যথেষ্ট সস্তা নয়, এখনও পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। ভারতে এখন সরকারিভাবে রুগি রয়েছে দশ লক্ষের মতো, এদের সবাই টেস্ট করে সেই টেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যানে ঢুকেছেন। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, এমন অনেক সংক্রামিত মানুষ আছেন, যাঁদের টেস্ট করাই হয়নি। আইসিএমআর-এর অ্যান্টিবডি সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে ভাইরোলজিস্ট শাহিদ জামিল বলেছেন এই সংখ্যাটা এখন ১৫ কোটি। বলাই বাহুল্য, ভারতে এখন অবধি টেস্ট হয়েছে মাত্র দেড় কোটি। বাকি সংক্রামিত মানুষগুলো অজানা, অধরা থেকে রোগটা প্রতিনিয়ত ছড়াচ্ছে। এই বিরাট ঘাটতি কমার নয়। এই ক্ষেত্রে একমাত্র করণীয় হচ্ছে,

টেস্টের অপেক্ষা না করে উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা (সিন্ড্রোমিক ট্রিটমেন্ট)।

মহামারীকালীন আপৎকালে এই উপসর্গ-ভিত্তিক চিকিৎসা একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। কলেরা, নিউমোনিয়া, যৌনরোগ ইত্যাদি নানান অসুখে এটি প্রয়োগ হয়েছে। এই পদ্ধতির সুবিধেগুলো হচ্ছে :

(ক) রুগি আসা মাত্র তার করোনা উপসর্গ তালিকার ন'টা উপসর্গের মধ্যে কমপক্ষে তিনটে থাকলেই তাকে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, জিঙ্ক, ভিটামিন-সি ও ডি দিয়ে চিকিৎসা দিয়ে দেওয়া হবে। যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু হবে ততই বাড়বে তার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

(খ) যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু হবে তত তাড়াতাড়ি রুগি অসংক্রামক হয়ে উঠবেন। তিনি রোগ ছড়াবেন না।

(গ) মহামারীর সময়ে উপসর্গ-ভিত্তিক চিকিৎসা যত জনের হবে, তাদের বেশিরভাগই হবেন কোভিড-১৯-এর রুগি। মহামারীর সেটাই বৈশিষ্ট্য। ক্বচিৎ কেউ তা না হলে এই চিকিৎসায় তাঁর কোনও ক্ষতি হবে না।

(ঘ) এই চিকিৎসা করবে সরকারি, বেসরকারি, সমস্ত হাসপাতালের আউটডোর, পুরসভার ক্লিনিক, প্রাইভেট ডাক্তাররা, এমনকী গ্রামেগঞ্জে প্র্যাক্টিসরত কোয়াকরাও।

(ঙ) ভ্যাক্সিন বা টিকা : এই মুহূর্তে ২০৫টি ভ্যাক্সিনের কাজ চলছে। এর মধ্যে ১৯টির মানুষের ওপর পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সামনের সাত-আট মাসের মধ্যে হইহই করে সাত আটটা ভ্যাক্সিন এসে যাবে বাজারে। ভারতীয় 'কোভ্যাক্সিন'-এর কথা বাদ দিলে বাকিগুলো কিন্তু বাণিজ্যিক, তাই আদৌ সস্তা হবে না। যাতে মানুষ আবার ঘটি-বাটি বিক্রি করে ভ্যাক্সিন নিতে ছোটে সেই জন্যই আতঙ্ক জিইয়ে রাখার বা যথাসম্ভব বাড়ানোর কাজ চলছে। কিন্তু এই ভ্যাক্সিনগুলো কতদিন সুরক্ষা দেবে কেউ জানে না। বছরে ক'বার নিতে হবে কিংবা কত বছর পর পর নিতে হবে কেউ জানে না। গবেষকদের কেউ কেউ বলেছেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে শরীরে যে স্বাভাবিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, তার স্থায়িত্ব কয়েক মাস মাত্র। এই পরিস্থিতিতে ওই ভ্যাক্সিনগুলো কতটা দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দেবে তা অজানা। কোনও ওষুধই ১০০ শতাংশ সুরক্ষা দেয় না; এই ভ্যাক্সিনগুলোও দেবে না। সেটা বুঝেই প্রতিদিন মিডিয়া-ইউটিউবে দেখা যায় 'ভ্যাক্সিন সফল, এই এলো বলে!'

এই পরিস্থিতিতে ভ্যাক্সিন বা টিকার ওপর যত না ভরসা রাখা যায়, তার চেয়ে বেশি কার্যকরী হবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং সুচারু, দ্রুত ও কার্যকরী চিকিৎসা। উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা (সিন্ড্রোমিক ট্রিটমেন্ট) ছাড়া ভারতের মতো বিশাল, বৈচিত্র্যময় ও জনবহুল দেশে যেখানে ৭৫ শতাংশ গ্রাম এবং ২৫ শতাংশ শহরাঞ্চল, সেখানে আর কোনও রাস্তা আছে বলে তো মনে হয় না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দেশ তথা পৃথিবীর বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। এই কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে 'আত্মনির্ভরতা'র অর্থ স্বদেশী ওষুধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, যথা— মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন এবং স্বদেশী টিকা অর্থাৎ 'কোভ্যাক্সিন'।

(লেখক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ)

করোনা মহামারী ও ভবিষ্যতের ভারত

ডাঃ আর এন দাস

আমি নস্ট্রাডমাসের মতো ভবিষ্যদ্‌বক্তা, জুলে ভার্নের মতো বিজ্ঞানভিত্তিক কল্প-কাহিনিকার কিংবা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো নীতিনির্ধারক নই। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমান করতে পারি, অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত এই করোনা মহামারীর অদূর ভবিষ্যতের পরিণাম! হার্ভার্ডের সংক্রামক রোগবিশেষজ্ঞ মার্ক লিপসিজ বলেছেন, 'যদিও জানুয়ারি, ২০২০-র মতো ভয়ংকর কিছু হবে না, তবে বছর কয়েক করোনার প্রভাব সারাবিশ্বে জনজীবনের উপর প্রতিফলিত হবে'। একবার মাত্র সামাজিক সমাবেশে প্রতিবন্ধ লাগিয়ে, স্কুল-কলেজ, কলকারখানা বন্ধ করে, বাজারহাট নিষিদ্ধ করে লকডাউন পালন করে করোনাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনাও প্রবল।

ইদানীং বিশেষজ্ঞরা ১৮৩৪ সালে স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ার বর্ণিত এডিনবরা ও গ্লাসগোর মধ্যেকার ইউনিয়ন ক্যানালে যে, সলিটন ওয়েভের জলতরঙ্গ উঠেছিল, তার সঙ্গে করোনার তুলনা করছেন। খুব স্ফীত আর বিশাল জলের ঢেউ অনেক ঘণ্টা পর ক্রমশই যেমন নিস্তেজ হয়ে যায়, করোনার অবস্থাও তেমনই হবে।

আজকের শহরমুখী জীবনব্যবস্থায় ও বিশ্বায়নের যুগে, প্লেন- ট্রেনের দৌলতে স্থান ও সময়ের ব্যবধান অনেক কমে গেছে বলেই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও দৈনন্দিন জীবনশৈলীর পরিবর্তনের উপরেই বহুলাংশে নির্ভর করছে করোনার নিয়ন্ত্রণ।

প্রতিবেদন লিখা অবধি জানা যাচ্ছে, সারাবিশ্বের ১৯৫টি দেশে ৬ লক্ষেরও বেশি লোক মারা গেছে। আমেরিকা ও ব্রাজিলের পর তৃতীয় স্থানে ভারতের মৃত্যুহার ২৬ হাজারে পৌঁচেছে। সংখ্যা হয়তো আরও বেশি হতো কিন্তু মমতা ব্যানার্জির মতো মুসলমান ভোট ভিখারীরা সত্য গোপন করে রাজ্য সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্যবিভাগের কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। সেজন্যই তথ্য গোপনে দক্ষ অপরাধী আইপিএস রাজীবকুমারকে তথ্য দপ্তরের সচিব করা হয়েছে।

নভেম্বর, ২০১৯ উহানের মাংস-বাজার থেকেই এই সংক্রমণ ছড়ায়। সেকথা চালাক চীন চেপে যায়। উহানে পড়াশোনা ও বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত আন্তর্জাতিক পরিযায়ী শ্রমিকরাই সারাবিশ্বে সংক্রমণ ছড়ায়। ভারতে প্রথম ৩০ জানুয়ারি, ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০-তে উহান ফেরত তিন জনের রক্তে কোভিড-১৯ ধরা পড়ে। পরে ২ মার্চ হায়দরাবাদ ও দিল্লিতে ধরা পড়ে আরও দুজনের। এরপরই হু হু করে সেই সংখ্যা বাড়তে থাকে। ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রক অনতিবিলম্বে ইবোলা, সার্স ও প্লেগ মহামারীর মতোই আন্তর্জাতিক ভ্রমণযাত্রীদের ১৪ দিনের কোয়ারান্টাইন এবং এপ্রিলের ১৫ পর্যন্ত বিদেশি ভিসা বাতিল করে। রাজ্য সরকারকে ১৮৯৭ সালের এপিডেমিক ডিসিস অ্যাক্টের নিয়মানুযায়ী সন্দিগ্ধ ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা, আইসোলেশন, চিকিৎসা, কোয়ারান্টাইন, ভিড়জায়গা, বাজারহাট, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, উপাসনাস্থল এবং

মাত্রাতিরিক্ত জনসমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অনুরোধ করা হয়। এমনকী লকডাউনে হাসপাতালের ইমারজেন্সি ছাড়া সব বিভাগই বন্ধ করতে বলা হয়। টেলিমেডিসিন দ্বারা 'আরোগ্যসেতু অ্যাপ' চালু করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ মার্চ, ১৪ ঘণ্টার জন্য 'জনতা-কারফিউ' জারি করেন। স্কুল-কলেজ, স্টেডিয়াম ও রেলকোচকে কোয়ারান্টাইন সেন্টার করা হয়েছে। 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'— নীতি মেনে, ভারত সার্কের দেশগুলিকে ১০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়ে সম্মিলিতভাবে করোনা-যুদ্ধের উদ্যোগ নিয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ভারতের ১.৩৫ বিলিয়ন এবং উত্তরপ্রদেশের ২২ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে করোনা নিয়ন্ত্রণের অসাধারণ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছে। কেরলে সবথেকে বেশি টেস্ট হয়েছে অথচ 'তবলিগি জামাতে'র মৌলবিদের উপস্থিতি গোপন করার জন্য মুসলমানদের চাপে মমতা ব্যানার্জি প্রথমে টেস্টকিটের অভাবের দোহাই দিয়ে পরীক্ষাই করছিলেন না।

শুধুমাত্র প্রশাসনের উপর দোষ চাপিয়ে দায়মুক্ত হওয়া নয়। করোনার নিয়ন্ত্রণে আজ সমাজকেও সক্রিয় হতে হবে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মার্চ পর্যন্ত ঠিকই ছিল কিন্তু নিজামুদ্দিন তবলিগির জনসমাবেশ এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের আন্তঃরাজ্য যাতায়াতেই ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে করোনার ঢেউয়ের অস্বাভাবিক ও আকস্মিক বৃদ্ধির কারণ।

আজ থেকে ৩০০ বছর আগে ইউরোপীয় দেশগুলি ঔপনিবেশিক যুগের সৃষ্টি করে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের ভারত থেকে হতদরিদ্র অসহায় শর্তাবদ্ধ শ্রমিকদের সারাবিশ্বে অধিকৃত দ্বীপগুলিতে নিয়ে যেত। এভাবেই শুরু হয়েছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের ইতিহাস। আজ সারাবিশ্বে কমিউনিস্ট চীন পুঁজিবাদীদের সেই জঘন্য অপরাধই করছে অন্য নামে অন্য ভাবে।

গত শতাব্দীতে এমন মহামারী একটিও হয়নি। ভবিষ্যতে হয়তো আরও বড়ো মহামারী হবে। আজ সারাবিশ্ব সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ব্যতিব্যস্ত। কয়েক দিনের সাধারণ যুদ্ধে হাজারখানেক সৈন্যের প্রাণনাশ হলেই, সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশেষ অধিবেশন ডেকে যুদ্ধ সমাপ্ত করে। কিন্তু এই অনির্দিষ্টকালীন, অভূতপূর্ব বিশ্বব্যাপী এক অদৃশ্য জৈবযুদ্ধ--- অসংখ্য বিজ্ঞানী, রাজনেতা, কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘকে আজ অসহায় করে তুলেছে। করোনার কারণেই আজ গৃহবন্দি ভীতসন্ত্রস্ত আবালবৃদ্ধবণিতা, জনশূন্য রাজপথ, কোলাহলবিহীন স্কুল-কলেজ, আমোদপ্রমোদহীন নীরস শুষ্ক জীবন ও নিস্তব্ধ কলকারখানা! সিনেমা, থিয়েটার, বাজারহাট, দোকানপাট, খেলার মাঠ, ট্রেন, প্লেন, অফিস, কোর্টকাছারি সব শূন্য। রেস্টুরেন্ট, হোটেল এবং মানুষহীন হাসপাতাল! আশ্চর্য লাগছে! হলিউড ও ডিসনিল্যান্ডের গ্রহান্তরের জনপদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। শহরকেন্দ্রিক জীবনের এই কী শেষ পরিণতি? বন্যপ্রাণীরা অরণ্য ছেড়ে অবাধে রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! লোভী স্বার্থপর মানুষ নিজের অপূরণীয় কামনায় প্রকৃতিকে নিরন্তর শোষণ করে চলেছে! পরিবেশ প্রদূষণের কারণে ওজোন লেয়ারের ছিদ্র দিয়ে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে বিষাক্ত অতিবেগুনি রশ্মি।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগেই রয়েছে সারা পৃথিবীতে। নগরকেন্দ্রিক শিল্পায়ন, ইট-বালি-সিমেন্টের তৈরি লোহার খাঁচার মধ্যে দমবন্ধ করে পড়ে আছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি এবং মানবতাহীন রবোটিক জীবন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'লও হে নগর সভ্যতা, দাও হে অরণ্য ফিরে!'

মিশনারি ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে গ্রাফ করে দেখিয়েছিলেন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এক্সপোনেন্সিয়াল ও খাদ্যের সরবরাহ হয় লিনিয়ার রেটে। পৃথিবীর ৭.৮ বিলিয়ন জনসংখ্যাই কি এই মহাসংকটের কারণ নাকি অকৃতজ্ঞ মনুষ্যকৃত প্রকৃতির সীমাহীন শোষণ? আজ মানব সভ্যতা চরম ধ্বংসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ বিভাগের প্রধান ইঙ্গার অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'স্বার্থপর মানুষ অবৈধভাবে বনাঞ্চল অধিগ্রহণ করছে। সেজন্যই বন্যপ্রাণীর বহু রোগ মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে'। মধ্যযুগে, চতুর্দশ শতাব্দীতে, সারা ইউরোপের ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ৫০ মিলিয়ন লোক প্লেগ মহামারীতে মরেছিল। গত শতাব্দীতে ২০ বছরের অন্তরালে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ২.৩ বিলিয়ন জনসংখ্যার ৩ শতাংশ অর্থাৎ ৮৫ মিলিয়ন মারা যায়। লোকক্ষয়ের ভয়েই সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সৃষ্টি করা হয় ১৯৪৫ সালে। তখনকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪.১ ট্রিলিয়ন ডলার। আজ সারাবিশ্বে করোনা মহামারীতে ২.১ ট্রিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সেটা বেড়ে ৮.১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে।

বিজ্ঞানের দান অটোমোবাইল আজ শূন্য রাস্তায় অর্থহীন। গৃহবন্দি মানুষ আজ মোবাইল ফোনে ব্যস্ত। অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞানীরা জীবাণু বিধ্বংসকারী অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন কিন্তু ডাক্তারবেশী ডাকাতদের অপরিণামদর্শীতার কারণে তা আজ অকেজো হয়ে পড়েছে। সারাবিশ্বে করোনা ভাইরাস মারার কোনো ওষুধ নেই। ভ্যাকসিন তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা চলছে কিন্তু কতটা সফল হবে তা ভবিষ্যৎই জানে! আমেরিকান বিজ্ঞানী ডাঃ কিসলারের মতে ৫০ শতাংশের বেশি হার্ড ইম্যুনিটি হলে তবেই করোনার সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। করোনার কারণেই জল, বিদ্যুৎ, খাবার এবং কাজের অভাব বেড়েছে। ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। ভ্রমণ ও পর্যটনশিল্প, স্টক মার্কেট, সরবরাহের শৃঙ্খলা, সামাজিক বৈষম্য এবং বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আজকের জগতে সবচেয়ে মারাত্মক মারণাস্ত্র হচ্ছে 'বাণিজ্য'। সিপেকের প্রণেতা চীনের শি জিনপিং বলছেন, প্রাণের বিমিময়ে চীনের অর্থনীতিকে বাঁচাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন, না অর্থের বিনিময়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে। এটাই 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র সঠিক মূল্যায়ন।

সুসভ্য মানবসমাজের জন্য চাই জীবমণ্ডল আর প্রকৃতির মধ্যে সুষম এবং সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মতো শিক্ষা, শিল্প, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য— সমস্তকেই আজ গ্রাম ও শহরতলিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। করোনার পরে যে অবস্থা আসছে, তাতে সারাবিশ্বই এক নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হবে। সনাতন ভারতীয় সভ্যতার 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর অমূল্য

শিক্ষাই পাওয়া যাবে এই মহামারীর কারণে। শুধু নিজের ভালো থাকা নয়, সবাইকেই ভালো রাখতে হবে। সমস্ত জগতই আমার পরিবার। প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিরা একাত্মতা সূত্র শিখিয়েছেন 'সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্যংকরবাবহৈ' — তা না হলেই যুদ্ধ লেগে থাকবে, শান্তি আসবে না। মানুষের জন্য পৃথিবীই একমাত্র বাসস্থান। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

করোনার কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য— সমস্ত কিছুর মধ্যেই এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসতে চলেছে। জনাকীর্ণ শহর থেকে বেরিয়ে এসে আগামী প্রজন্মের মানুষ গ্রাম ও শহরতলিতে হাইটেক প্রযুক্তির সাহায্যে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বাণিজ্যের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ভার্চুয়াল মিটিং ও অনলাইন ক্লাস হবে। কর্মের সন্ধানে দেশান্তরে অভিগমন অনেক কমে যাবে। মোদীজীর 'ক্যাশলেস ইকোনমি' এবং 'ডিজিটাল ইন্ডিয়ার' সার্থক রূপান্তর ঘটবে। তাতে দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, কালোটাকা, মুদ্রাস্ফীতি কমবে। জীবন অনেক সহজ ও সরল হবে। অসংখ্য নদীনালা পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, শস্যশ্যামলা ভূমি, এই কৃষিপ্রধান দেশের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা' সারাবিশ্বের আদর্শরূপে গণ্য হবে। গান্ধীজীর পরিকল্পিত 'স্বদেশী ও স্বরাজ্য' ভারতকে আত্মনির্ভর করবে। উদাহরণ স্বরূপ যোগীজীর ফর্মূলা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মন্দিরের বাসি ফুল থেকে সুগন্ধিত ধূপশিল্প, প্লাস্টিকের পরিবর্তে বাঁশের বোতল, আখের রস থেকে স্যানিটাইজার স্পিরিট; গ্রামের মহিলাদের তৈরি পোশাক ইত্যাদি কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তিনি গত এক বছরে ২৯ শতাংশ রপ্তানির হার বৃদ্ধি করিয়েছেন। মোদীজীর প্রেরণায় যোগীজী প্রতিটি জেলায় কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সড়ক ও সেতু নির্মাণ এবং সরকারি সহযোগিতায় সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিবিপনির ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে ২২ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান করতে পেরেছেন। জনসংখ্যা ও আয়তনে ভারতের বৃহত্তম রাজ্যের গেরুয়াধারী মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসন ক্ষমতা সারাবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জার্মানির ভন ওয়েলেক্স জুতো কোম্পানি চীন থেকে আগ্রায় সরে এসে, ১১০ কোটি টাকা লগ্নি করে বছরে এখন ৩০ লক্ষ জোড়া জুতা উৎপাদন করছে। সরকারের সহজ, সরল ও স্বচ্ছ বিনিয়োগ নীতি, সুগম সড়ক ও সরবরাহ, সুদক্ষ ও সস্তায় পাওয়া শ্রমিকদের জন্যই ৩০০টি বিদেশি কোম্পানি এবং তাদের সহযোগী ৫৫০টি ক্ষুদ্রশিল্প চীন ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিনিয়োগ করতে চলেছে।

ভবিষ্যতে আরও ভয়ংকর নতুন কোনো মহামারীর আশঙ্কা নিবারণের জন্য বিজ্ঞানীরা বলেছেন, 'মানুষের রোগের সঙ্গে গৃহপালিত ও বন্য পশুপাখির রোগের এক গভীর সম্পর্ক আছে। তাই পরিবেশ, চিকিৎসাবিদ্যা, পশুপালন এবং সামাজিক বিদ্যার বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই ভবিষ্যতের মহামারীকে রোধ করা যাবে'।

পূর্বের মহামারীগুলি যেমন ১৯৯৭ সালের এভিয়ান ফ্লু, ২০০২ সালের সার্স, ২০০৯ সালের সোয়াইন ফ্লু এবং ২০১৪ সালের ইবোলার উৎপত্তি হয়েছিল পশুপাখি থেকেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বর্তমান করোনার উদ্ভবও হয়েছে বাদুড়, সজারু ও পিপীলিকাভুকের বর্ণসংকর প্যাঙ্গোলিনে ভাইরাস মিউটেশনের মাধ্যমে।

করোনার প্রথম সংক্রমণের ঢেউকে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত না করে শিথিলতা দেখালে কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউয়ের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। যেমন হয়েছে, হংকং, জাপান ও সিঙ্গাপুরে। প্রথম লকডাউনের পর সীমান্তে শিথিলতা দেখানোর পরেই নতুন করে আবার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার শিথিলতার সুযোগে ভারত ছাড়াও ইউরোপীয় দেশগুলি এবং আমেরিকাতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সম্ভাবনা প্রবল।

সম্প্রতি জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে নোংরা জল, নর্দমা ও এয়ারকুলার থেকেও কোভিড-১৯ পাওয়া গেছে। সুতরাং সাবধান! মোদীজীর স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন ও পরিযোজনা এবার নিশ্চয়ই সাকার হবে।

তাছাড়া, অদূর ভবিষ্যতে 'আত্মনির্ভর ভারত' শুধু সার্স-কোভ-২ ভাইরাস অ্যান্টিজেন বা ভারত বায়োটেক ভ্যাকসিনই নয়, এর বিরুদ্ধে শরীরে তৈরি রোগ প্রতিরোধক অ্যান্টিবডির সনাক্তকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদন এবং সর্বত্র সরবরাহের ব্যবস্থাও করবে।

সবশেষে এটাই বলা যায়, করোনার পরবর্তী সময়ে ভারতে সামরিকশক্তি বাড়ানো, অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণের সঙ্গে স্বাস্থ্য- বিভাগের উন্নতি একান্তই প্রয়োজনীয় হবে। যদিও গত ১১ বছরে ভারতে শিশু মৃত্যুর হার ৪২ শতাংশ কমেছে কিন্তু এখনও সমগ্র ভারতে প্রয়োজন ২.৫ লক্ষ শিশুরোগ, ৩.৫ লক্ষ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং ২ লক্ষ রেডিওলজিস্টের। পশ্চিমবঙ্গে অপ্রতুল পিপিই, টেস্টকিট, সীমিত সংখ্যার হাসপাতালে উপযুক্ত বেডের অভাব, সর্বত্র ডাক্তার ও নার্সের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সংক্রমণ বিশেষজ্ঞের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উপরই জোর দেওয়া জরুরি হবে।

ভবিষ্যতের মহামারীর কথা মাথায় রেখে ইন্টিগ্রেটেড ডেটা সারভেইলান্স প্রোগ্রাম, রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট, সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন এবং অ্যান্টি-ভাইরাল বা অ্যান্টিবায়োটিকের উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া জরুরি হবে। সমুদ্র মন্থনে প্রথমে বিষ পরে অমৃত উত্থিত হয়েছিল, পরে অমৃত।। করোনার শেষে আমরা অনেক কল্যাণকারী পরিবর্তনও লক্ষ্য করবো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সিকিউরিটি কাউন্সিলের আমূল ও রচনাত্মক পরিবর্তন বহু প্রতীক্ষিত। আজও শীতযুদ্ধে জড়িত, সুরক্ষা পরিষদে একচেটিয়া অধিকারের সুবিধাভোগী ও বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী সেইসব আণবিক শক্তিধর দেশগুলির পরিবর্তে ভারত, জাপান ও জার্মানির মতো দেশের অন্তর্ভুক্তি এবং ভেটোশক্তির অবপব্যবহারের জন্য চীনের বহিষ্কার হওয়া প্রত্যাশিত।

ভারত বিভাজনের প্রকৃত ইতিহাস ও বিকৃত ইতিহাসের পুনর্লিখন অবশ্য প্রয়োজন। সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের পরিপন্থী এবং তথাকথিত সংখ্যালঘুর আনুকূল্যের পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনের দাবিও বহু প্রত্যাশিত। ■

করোনা নিয়ে আপাতভয়কে দূরে সরান ফিরবে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ

স্বপন দাস

এই মুহূর্তে সারাবিশ্ব করোনার আতঙ্কে জর্জরিত। আমাদের দেশ, এমনকী ক্ষুদ্র নিরীখে আমাদের রাজ্যও। এই মুহূর্তে আমরা খুঁজতে ব্যস্ত কীভাবে এর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই ভ্যাকসিন আমাদের আয়ত্তে চলে আসবে। তখন আমরা অনেকটাই আমাদের নিজেদেরকে নিরাপদ বলে ভারতে পারব। কিন্তু এই ভাবার পর, অর্থাৎ করোনা আতঙ্ক কেটে যাবার পর বা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কমে গিয়ে একটু একটু করে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসার পর কেমন হতে পারে আমাদের সার্বিক অবস্থা? এই প্রশ্ন ঘুরে ফিরেই আসছে। তার কারণ আর কিছুই নয়। আমরা এই একটা বিশাল সময়ে কয়েকটা মারাত্মক অনুভূতি ও বাস্তব অবস্থাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরবন্দি অবস্থায় অন্য একরকম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। যেখানে চিরকালীন জীবনের যে ছন্দ, সেই ছন্দটাই নেই। একেবারে উলটো একটা আবর্ত, যেটা কাঙ্ক্ষিত না হয়েও আমাদের জীবনে বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। কারণ দুটো, নিজেদেরকে যে করেই হোক রক্ষা করতে হবে। আর মনের মধ্যে থাকা করোনার মারণ রূপের কল্পনার যে ট্রমা নানা আবরণে তৈরি হয়েছে সেটা সযত্নে লালিত করে জীবনের ছন্দটাকেই অবচেতন মনে নিজস্বতা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।

এই জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ কি আবার ফিরে আসবে? যদি ফিরে আসে, তার চেহারাটা কেমন হবে? আর আমাদের সামাজিক বিষয়টা কেমন দেখতে হবে? আমরা ফিরে যেতে পারব কি সেই আগের ট্রমাহীন জীবনে? এসব প্রশ্ন উঠছে। চিকিৎসকদের মতে, আমাদের মনের ট্রমা থেকেই মনের গভীরে বাসা বেঁধেছে অজানা আতঙ্ক ও মৃত্যুভয়। মানুষ নানা মাধ্যম, সে সামাজিক মাধ্যম হোক বা টেলিভিশন মিডিয়া, প্রিন্ট হোক বা ডিজিটাল মিডিয়া, কোথাও মানুষকে ভয় কাটাবার চেষ্টার থেকে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান দিতেই বেশি ব্যস্ত। কোথাও বেশি করে হাইলাইট করা হচ্ছে না করোনাকে জয়ের বিষয়টা। অন্যদিকে করোনা নিয়ে নানা চিকিৎসা ব্যবস্থার ত্রুটি ধরতেই ব্যস্ত বিভিন্ন মাধ্যম। কিন্তু এই চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে, যে সিংহভাগ আক্রান্তরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন, তাঁদের কথা বা এই জয়ের পরবর্তী জীবনের গল্প, কোনো মিডিয়াতে আসছে না। একটু অন্য বিষয়ের দিকে যদি চোখ রাখা যায়, কোনো মিডিয়া কিন্তু কর্মহীন মানুষকে বিকল্প রোজগারের পথ দেখাতে সাহায্য করছে না। রাজনৈতিক ভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষের গুণগানে ব্যস্ত থাকতেই সময় যাচ্ছে তাদের। এখন টিআরপি বাড়াবার লক্ষ্যে মিডিয়ায় ভায়োলেন্স অগ্রাধিকার পায়। মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলতে এই বিষয়গুলিও চিকিৎসকরা তাঁদের কথার মধ্যে এনেছেন প্রসঙ্গ ক্রমে। কথা বলছিলাম নানা চিকিৎসকের সঙ্গে, সমাজতত্ত্ববিদের সঙ্গে, অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে ও মনস্তত্ত্ববিদদের সঙ্গে। তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী বলছেন?

করোনা নিয়ে এমন কিছু সরকারি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা হয়েছে, যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে সুস্থ করে চলেছেন। কী বলছেন তাঁরা? ডাঃ প্রাঞ্জল রায় একজন মেডিসিনের চিকিৎসক। তাঁর মতে, এই ভাইরাসকে সঙ্গে নিয়েই আগামীদিনে চলতে হবে সবাইকে। ফলে চিন্তাভাবনাটা সেখান থেকেই শুরু হওয়া দরকার। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, কোভিড হাসপাতাল ছাড়াও অন্য সব হাসপাতালে সরকারি নির্দেশিকায় করোনা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আশি শতাংশ। তবুও এত রোগীর চাপে, সামান্য কয়েকটা আইসোলেশন বিভাগের বেডে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তিনি সাধারণ রোগীদের সঙ্গেই থাকছেন। পরে দেখা যাচ্ছে, তিনি পজিটিভ। এই যে কদিন তিনি ওয়ার্ডে রইলেন, বহু রোগীর সংস্পর্শে

এলেন, তাঁদের কী হবে? ওয়ার্ড স্যানিটাইজেশনের বিষটা তো দূরের কথা। তিনি দাবি করেন, সমস্ত স্টেট জেনারেল হাসপাতালে খোঁজ নিলেই জানা যাবে বিষয়টা। সেই জন্যই এই মুহূর্তে ভবিষ্যতে কী হতে পারে, সেটা বলা খুব একটা সহজ নয়। আগে মানুষ বাঁচুক। তারপর দেখা যাবে ভবিষ্যৎ। তিনি আরও বলেন, এই রোগে একেবারে শুরুর সময়ে চিকিৎসার সুযোগ নিলেই কোনো ভয় নেই। আর মেনে চলতে হবে কিছু নিয়ম ও নীতি, সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি। আর একজন মেডিসিনের চিকিৎসক অনির্বাণ সাহা বলেন, এই ভাইরাসের মারণ ক্ষমতা একেবারে নেই বলব না। তবে খুব কম। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই কম, তারাই একটু বেশি ভয়ের। নইলে নয়। আর মানুষের মনে ভয় ধরিয়ে চলেছে সমস্ত মিডিয়া। তারা, তাঁদের এই বিষয়টাকে নিউজ আইটেম বানিয়ে মানুষের মনে নানা ভাবে ভয়ের জন্ম দিচ্ছে। মানুষ সেই ভয়ের কারণে হাসপাতালে আসতে চাইছেন না। পরীক্ষা করাতে চাইছেন না। ফলে বেশ দেরিতে একজন আক্রান্তের পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন চিকিৎসকরা। অনেকে আবার সামান্য জ্বর হলে বাড়িতে নানা রকম ওষুধ খেয়ে সেটা সারাবার চেষ্টা করছেন। আর দেরি করছেন চিকিৎসকের কাছে আসতে। এই কথাটা বলার একটাই কারণ, তিনি মনে করেন আগামীদিনে মানুষের মনের ভয়ের ট্রমাকে দূর করার জন্য যতরকম ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেটাই নিতে হবে। তবেই মানুষ চিকিৎসার সুযোগ নিয়ে নিজেকে সুস্থ করে তুলবে। সমস্ত চিকিৎসকের মতে, বিশ্ব ভ্যাকসিন এসে গেলে এই ট্রমার সিংহভাগটাই দূর হবে। মানুষ নিজেকে নিরাপদ ভাবতে শুরু করবে।

বর্তমানে সামাজিক দূরত্ব নামক শব্দটি আমাদের সমাজ জীবনে ভালো তো করেইনি, উলটে ভবিষ্যতের জন্য একটি রোগের জন্ম দিয়েছে। এখন নানা সংবাদমাধ্যমে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, একজন করোনা আক্রান্তকে সমাজ অচ্ছুত শ্রেণীভুক্ত করে দিচ্ছে। শুধু তাঁকে নয়, তাঁর গোটা পরিবার একঘরে হয়ে যাচ্ছে। আরও লক্ষ্য করলে দেখবেন, বহু করোনা যোদ্ধা সে চিকিৎসক হন বা চিকিৎসাকর্মী, তাঁরা অনেকেই পাড়া প্রতিবেশীদের বাধার কারণে নিজের বাড়িতে ঢুকতে পারছেন না। কয়েকদিন আগে এক বিডিয়োকে বাড়ি ঢুকতে হয়েছে পুলিশি সাহায্য নিয়ে। আর একজন চিকিৎসকের দাদাকে মার খেতে হয়েছে এই অপরাধে যে, শুধুমাত্র তাঁর ভাই করোনা চিকিৎসক বলে। এই ব্যাধির একটা খারাপ দিক হচ্ছে, ভবিষ্যতে যখন সব স্বাভাবিক হবে তখন এই অত্যাচারিত মানুষগুলি প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা যেটা মনের ভিতর লুকিয়ে থাকছে, সেটা নানা ভাবে নেবার চেষ্টা করবে। ফলে ভবিষ্যতের সমাজ ব্যবস্থায় পারস্পরিক সহমর্মিতা বোধের যে চিন্তাধারার ওপর সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে, সেটাতে বড়ো ধরনের আঘাত আসবে।

মনোবিদ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, করোনা পরবর্তী সময়ে কতদিনে মানুষ আবার তাঁর স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারবেন সেটা বলা শক্ত। কেননা, সে এই ঘরবন্দি অবস্থায় নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। একদিকে রোগটাকে মারণ কল্পনা করে একধরনের ট্রমা নিয়ে চলতে হলো, অন্যদিকে নানাভাবে তাঁকে গ্রাস করল অর্থনৈতিক সমস্যা। তাঁর নিত্যদিনকার চাহিদা মেটাবার ক্ষমতাও হয়তো হ্রাস পেল এই সময়ে, সে অনেকগুলি কারণে হতে পারে। যেমন কর্মহীন হয়ে পড়া বা চাকরি চলে যাওয়ার মতো ঘটনা বেশি মাত্রায় ঘটবে ভবিষ্যতে। ফলে বেশ কিছু বিষয় চলে আসতে পারে। অপরাধ প্রবণতা বাড়তে পারে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বাড়তে পারে, মানসিক অবসাদের শিকার হতে পারেন অনেকে। তার ফলে নানা অঘটনের সাক্ষী হয়তো হতে হবে আমাদের সবাইকে। তবে এসব দূর করবার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যেমন এই পরিস্থিতির পর একজন মানুষের মনে নিজের প্রতি বিশ্বাসটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে করোনা পরবর্তী সময়ে বেশ কিছুদিন লাগবে মানুষের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতে।

এই করোনা পরিস্থিতিতে সারাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে এক চরম দুঃসময়। করোনা পরবর্তী সময়ে এটা ভালো ভাবে বোঝা যাবে একটি কারণে, সাধারণ মানুষের খাবার জোগানের সংকট দেখা দেবে। কেনন সরকার আজ হয়তো নানা ভাবে সাহায্য করছে। কিন্তু দীর্ঘদিন তো আর এটা করবে না। ফলে প্রত্যেকটি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্রে এক গভীর সংকট দেখা দিতে পারে। এর পিছনে আরও একটি কারণ আছে, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাবে বা নানা কারণে থাকবে না। এর প্রথম কারণ, বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বেন। দুই, বিকল্প ভাবে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি বা নেই। তিন, সরকারি ভাবে এমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এখনও পর্যন্ত যে ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের একমুঠো ভাতের ব্যবস্থা, যতদিন না সব স্বাভাবিক হয়, ততদিন পর্যন্ত পেতে পারেন। চার, প্রত্যেকটি রাজ্যে ফিরে এসেছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কী হবে, সেটাও এখনও পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট ভাবে সরকারি স্তরে চিন্তাভাবনা হয়নি। একেই আমাদের রাজ্যে বা আমাদের দেশে কর্মহীনতা একটা ব্যাধি, সেই পরিস্থিতিতে এই বিষয়টা ভবিষ্যৎকে কতটা সুন্দর করে তুলবে, সেটা ভাববার বিষয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, মানুয়ের চাহিদার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সব কিছু।

এই চাহিদাকে পূরণ করার জন্য দরকার প্রত্যেক মানুষের হাতে ক্রয় ক্ষমতা। সেটা না থাকলে পুরো ব্যবস্থাটাই এলোমেলো হয়ে পড়বে।

এই লেখার শুরুতে বলা হয়েছিল, এই করোনা সংকট কবে কাটতে পারে? এর উত্তর বিজ্ঞানীদের কাছেও নেই। এখন দেখার কবে লড়াই জেতার ভ্যাকসিন আসে আর আমাদের মনের মধ্যে থাকা ভয়কে জয় করতে সাহায্য করে। মনে রাখতে হবে, করোনাকে ভয় নয়, করোনা মানুষকে সহজে মারতে পারে না। আপনি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। যদি বলেন কীভাবে? প্রথমেই বলব, মনের ভয় তাড়িয়ে। তারপরে বলব, অন্যকে মনের ভয় তাড়াতে সাহায্য করে। ■

করোনা থেকে বাঁচতে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনশৈলী গড়ে তুলতে হবে

ডাঃ প্রভাত সিংহ

করোনা ভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেক জায়গায় গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও কড়া লকডাউন জারি করে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে নজর দেওয়া উচিত ছিল। তাতে সংক্রমণের তীব্রতাকে অনেকাংশে আয়ত্তে রাখা সম্ভব হতো। কিন্তু রাজ্য সরকার এই কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক করোনা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সরকারের যদি বোধোদয় হয়ে থাকে, তাহলে তাদের উচিত এখনই সারা রাজ্যে এক মাস বা তারও বেশি সময়ের জন্য কড়া লকডাউন জারি করে স্বাস্থ্যপরিকাঠামোর উন্নয়ন করা এবং হাসপাতালগুলিতে শয্যাসংখ্যা বাড়ানো। তারপর ভ্যাকসিনের জন্য অপেক্ষা করা।

বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে তাহলে আমাদের কী করণীয়? উত্তরে বলবো, দেশের বেশিরভাগ মানুষই স্বাস্থ্যবিধি মেনে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করা শুরু করেছেন। যাঁরা এখন্য করেননি, তাঁরাও অবিলম্বে শুরু করে দিন। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা মেনে নিয়মিত যোগব্যায়াম করুন, রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠুন।

আয়ুশ মন্ত্রালয় ইতিমধ্যেই আমাদের কী করণীয় তার একটা পথনির্দেশ দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এই ভয়ানক অতিমারীর সময় সার্বজনিক স্থানে প্রতি দুজন মানুষের মধ্যে অন্তত ছ'ফুট দূরত্ব রাখা, মাস্ক পরা, মুখে হাত দেওয়ার আগে ভালো করে হাত ধোওয়া এবং মনের জোর বাড়ানোর জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা খুবই জরুরি।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে এখন মৃত্যুর হার মাত্র ২ শতাংশ। তাই অযথা আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই সময় অনেক মানুষই সংক্রামিত হবেন এবং মানুষের নিজস্ব রোগ প্রতিষধক ক্ষমতাও এই সময় বাড়বে। তারপর যখন ভ্যাকসিন এসে যাবে তখন তা প্রয়াগ করা হবে দেশের বাকি মানুষদের ওপর।

এই ভাইরাসের প্রকোপ চলবে আরও অন্তত দু'বছর। সুতরাং আমাদের নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনশৈলী গড়ে তুতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবনশৈলীতে প্রত্যাবর্তন।

করোনা পরবর্তী সময়ে মানুষের মনে সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক সমস্যা

ডাঃ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

করোনা আবহে আমরা বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে ফেলেছি। এই সময় একটা অন্য রকম জীবনযাত্রায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। এর আগে যে জীবনযাত্রায় ছিলাম তা ছিল অনেকটাই ধীরগতিসম্পন্ন। কিন্তু করোনার সময়কালে লকডাউন পরিস্থিতিতে সেই গতি আর রইল না। এই পরিস্থিতি একদিনে মেটার বিষয় নয়। তারপর ধরা যাক ভ্যাকসিন এল। এরপর হয়তো জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হলো। আমি বলব পুরো স্বাভাবিক নয়, আংশিক স্বাভাবিক হলো। তখন মানুষকে আবার স্বাভাবিক ঋন্দে ফিরতে হবে। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষকে অনেক কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এই স্বাভাবিক ছন্দ বা জীবনের গতি আনতে হবে।

মানুষকে কতকগুলি সমস্যার মধ্যে পড়তেই হবে। তার মধ্যে প্রধান হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। লকডাউনের সময় যে বিশাল ক্ষতি হয়েছে, যা আমরা এখন হয়তো বুঝতে পারছিনা, সেটা ভয়ংকর ভাবে সামনে অসবে। কী ভাবে? অনেক মানুষের চাকরি থাকবে না, বেতন কমে যাবে। এগুলি কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই হবে। আর এটাই আমাদের মনে ভীষণ চাপের সৃষ্টি করবে। এ থেকে বেরিয়ে আসাটাই এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে গোটা সমাজকে। সিংহভাগ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। সেটা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। প্রথম যে ধাক্কা খাবে সেটা অর্থনৈতিক ধাক্কা। এ থেকেই এক বৃহদংশের মধ্যে আসবে অবসাদ। তারা নানাভাবে নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করবে জীবন থেকে। যেটা আমরা লকডাউনের সময়ও বেশ কিছু ঘটনায় লক্ষ্য করেছি। মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা খুব বাড়বে। তেমনই অবসাদ ও হতাশার কারণে বেড়ে যাবে পারিবারিক হিংসার মতো ঘটনা। যেটা করোনা-পূর্ববর্তী সময়ে বেশি ছিল না। আর একটি বিষয়, মানুষ এখন সরকারি ভরতুকিতে সামান্য হলেও খেতে পাচ্ছেন। এটা বন্ধ হলে আরও সংকট দেখা দেবে। আগামীদিনে মানসিক চাপ সম্পর্কিত রোগের প্রাদুর্ভাবও বাড়বে। যদি সরকারি তরফে মানুষের বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা দূর করা যায় তাহলে হয়তো আবার ফিরে পাওয়া যেতে পারে আগের মতো সুস্থ সমাজ।

(লেখক বিভাগীয় প্রধান, মনস্তত্ত্ব বিভাগ, জোকা ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল)

করোনা মানুষের জীবনে অনেক কিছুই অভ্যাসে পরিণত করে দেবে ভবিষ্যতে

ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস

গত কয়েক মাস ধরে আমাদের আলোচ্য বলা যাক, আর মনের কেন্দ্রবিন্দুর বিষয় বলা যাক, সবটা জুড়েই আছে করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯। একে কেন্দ্র করে আমাদের জীবনযাত্রা একেবারেই পালটে গেছে। অনেকে বলছেন, আড্ডাপ্রিয় বাঙ্গালি আড্ডা দিতেই ভুলে গেল। কেউ বলছেন সমস্ত সামাজিকতা ভুলে গেল বাঙ্গালি। আবার কেউ বলছেন আপামর বাঙ্গালি অন্য এক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল। কী কী বাঙ্গালি জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠল তা একবার দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই বলা যায়, করোনা সব মানুষকে একটা বিষয় শিখিয়েছে তা হলো নিজের ও আশেপাশের মানুষের সম্পর্কে সামান্য হলেও ভাবতে বা সচেতন করার ব্যাপারে সাহায্য করতে। সেই নিরিখে আমি বলব, করোনা পরবর্তী সময়ে নানা বিষয়ে মানুষের সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে। করোনা বা যে কোনো এই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অপরিহার্য হলো মাস্ক। আগামীদিনেও যে এই মাস্ক পরিহিত হয়ে থাকতে হবে মানুষ সেটা বুঝতে পেরেছে। আগে মাস্ক বিষয়ে মানুষ গুরুত্ব দিতেন না। এখন মানুষের চেতনা জাগ্রত হবে। আমরা অনুধাবন করতে শিখবো যে অনেক জীবাণুর প্রবেশ আটকাতে পারব যদি মাস্ক পরিহিত হয়ে থাকি।

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ কোনো রোগের আঁতুরঘর হয় না। সেটা আমরা বুঝে গেছি এই ক'দিনে। তাই সবাই চেষ্টা করেছি বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে বাইরের পরিবেশকেও জীবাণুমুক্ত রাখার। আগামীদিনে অর্থাৎ করোনা চলে গেলে আমরা পরিচ্ছন্ন থাকারই চেষ্টা করব। অনের রোগের মোকাবিলা করতে পারব যদি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি। শুধু করোনা নয়, পিছনেই আছে ডেঙ্গু বা নানা মশাবাহিত রোগ। আমরা জানি অতিরিক্ত জল জমলে মশাবহিত রোগ বেড়ে যায়। এই ব্যাপারেও আরও সচেতন করে তুললো করোনা।

করোনা আমাদের আর একটা ভয়ংকর শিক্ষা দিল। আমরা শিখলাম কোনো রোগকে সহজভাবে নেওয়া যাবে না। একেবারে প্রথমদিকে শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্ব করোনার মারণ রূপ বুঝতে না পেরে হালকা ভাবে নিয়েছিল। পরে যখন বোঝা গেল বিষয়টা এতটা হালকা নয়, তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে। করোনা তার নখের আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিল মানবজাতিকে। করোনা এই শিক্ষাই দিল যে, কোনো কিছুকেই আর হালকা ভাবে নেওয়া যাবে না। যে কোনো রোগ যা আমাদের মধ্যে আছে বা এসেছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চিকিৎসকরা ওষুধ দেন। সেটা নির্দেশ মেনে নিয়মিত খেতে হয়। নইলে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা কমে যায়। আর সেই সুযোগে করোনার মতো রোগ শরীরে ঢুকে পড়ে। তাই ওষুধ খাওয়াতে কোনোরকম অবহেলা করা যাবে না। করোনা আবহে আর একটা বিষয় শিখলাম, সেটা হলো সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলতে আর জনসমাগম এড়িয়ে চলতে। কেননা এটাই একমাত্র রাস্তা সংক্রমণকে না ছড়ানোর। এখন এটা অভ্যাস হয়ে গেল জনসমাগম থেকে দূরে থাকার। করোনার সময় আমাদের বন্দিদশায় একাকিত্বের সঙ্গী হয়েছে দূরভাষ। আগামীদিনে আমাদের আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, প্রেম, সম্পর্ক সবই হবে দূরভাষের মাধ্যমে।

আমাদের চিকিৎসা জগতেও বলতে পারি একটা দারুণ পরিবর্তন আসবে। সেটা হলো ভিডিয়ো কনসালটেশান। একজন রোগী বাড়িতে বসেই ভিডিয়োকলের মাধ্যমে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। আমার মতে করোনার সময় থেকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা নতুন মাধ্যম শুরু হলো। শিক্ষা ব্যবস্থাও একেবারে পালটে যাবে। করোনা আবহে পড়ুয়ারা ভার্চুয়াল পঠনপাঠনে অভ্যস্ত হলো। দেখা যাবে প্রাইভেট টিউশন থেকে স্কুল-কলেজেও পঠনপাঠন চলবে অনলাইনে। ফলে বেড়ে যাবে অনলাইন ক্লাশ। সাধারণ ভাবে বলতে পারি, যখন একটি মারণ রোগ বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সেটি আমাদের জীবনযাত্রায় যেসব প্রভাব ফেলে সেটাই ভবিষ্যতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

(লেখক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মেডিসিন বিভাগ)

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই চীনের পতন

অজয় সরকার

পূর্ব লাদাখের সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে আমাদের সামরিক ও রাজনৈতিক স্তরে দীর্ঘ আলোচনার পর মীমাংসা হলেও, সীমান্তের বাস্তব চিত্র ভিন্ন। মুখে মিটমাটের কথা বললেও, চীনের যে বদমতলব আছে, তার ইঙ্গিত তাদের কর্মপদ্ধতিতে বোঝা যায়। প্রথমত, চীন কিছু সৈন্য সীমান্ত থেকে সরিয়েছে বটে, তবে ফ্রন্ট লাইনের অনতিদূরেই সৈন্যসংখ্যা এবং যুদ্ধের অস্ত্র ও সরঞ্জাম বাড়িয়েছে। দেশি বিদেশি উপগ্রহ চিত্র অন্তত তাই বলে। দ্বিতীয়ত, আমাদের তরফ থেকে বার বার বলা সত্ত্বেও চীন কোনো অবস্থাতেই সীমান্তের মানচিত্র আদান-প্রদানে আগ্রহী নয়। মানচিত্র অদলবদল করলে, মীমাংসার শর্তসমূহ তথ্যায়িত হয়ে যায়। চীন বিশ্বাসঘাতকতায় পটু, তাই তারা মানচিত্রের বিনিময় করার ক্ষেত্রে এতো অনীহা দেখায়।

চীন কেন এসব করছে?

১. চীনের শসেন ব্যবস্থার যে স্বরূপ, তাতেই এর উত্তর নিহিত। একটা উদাহরণ : গালোয়ানে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে দু দেশের সৈনিকই মারা যান। ভারতের ২০ জন এবং বিদেশি সংবাদমাধ্যমের মতে, চীনের ৪৫ জন সৈন্য মারা যান। আমরা আমাদের বীরগতিপ্রাপ্ত সৈনিকদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছি। সারা দেশ এই বীর সেনানীদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে। অথচ, চীনের নিহত সৈনিকদের মৃতদেহ চুপিচুপি সবার অলক্ষ্যে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এটা শুধু অমানবিক নয়, এক অপরাধও বটে। যখন নিহত সৈনিকদের পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দিয়ে অতি গোপনে সেই দেলগুলো সৎকার করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এটা করা তো দূর, এটা ভাবাও পাপ।

কমিউনিস্ট পরিচালিত চীনে মানবতা ‘লৌহ যবনিকার’ অন্তরালে কাঁদছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর মানুষকে কি তথ্যের সর্বত্রগামিতা থেকে দূরে আটকে রাখা যায়? তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার এবং হংকংয়ের ঘটনা তো তারই ইঙ্গিত। হংকং তো আজ মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনের এক আন্তর্জাতিক মঞ্চ। সুতরাং পরিস্থিতির চাপে চীন যে One step backed only to move two steps forward-এর নীতি নিয়েছে, তা কমিউনিস্ট দর্শন মেনেই হয়েছে। তাই চীন সীমান্ত বিরোধ আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসায় উপনীত হলেও, বাস্তবে সে এমন কিছু করতে চায় না, যা তার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।

মূল উদ্দেশ্য কী?

কমিউনিস্টদের রাষ্ট্র সম্পর্কিত দার্শনিক ভাবনার ভিত্তি হলো, ‘রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্র’। অর্থাৎ এদের মতে রাষ্ট্র কখনো সর্বজনহিতকর এবং কল্যাণকামী ব্যবস্থা হতে পারে না। রাষ্ট্র মানেই ‘শ্রেণী দাসত্ব’ ও ‘শ্রেণী প্রভুত্বের’ লড়াইয়ের এক সচল প্রতিষ্ঠান। তাদের দার্শনিক ভাবনা জন্ম দেয় অপরের উপর প্রভুত্ব অর্জনের বাসনা বা অপরকে দাস বানানোর অশুভ প্রবৃত্তির। স্তালিন বলেছিলেন, পুজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো সাম্রাজ্যবাদ। ভদ্রলোক এটা বলেননি যে কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পরিণতিও হলো সাম্রাজ্যবাদ।

শি জিংপিং-এর পূর্বসূরি দেং শিয়াও পিং বলতেন, ‘কালক্ষেপ কর, নিজের শক্তিকে লুকিয়ে রাখো’। ঠিক যেন কোরানের আয়াত। কোরানেও বলা আছে, ‘শত্রুর জন্য ওত পেতে থাকো’... কী অদ্ভুত মিল! প্রায় ৩৫/৩৬ বছর যাবৎ দেং শিয়াও পিং-এর উপদেশকে চীনের শাসকরা কোরানের আয়াতের মতোই মান্যতা দিয়ে এসেছে। শি জিংপিং-এর সময় চীন আর অযথা ‘কালক্ষেপ’ করার বিলাসিতা দেখাতে পারে না, কারণ চীন আজ অর্থবল এবং সামরিক বলে

চীনের সুস্থ চেতনাসম্পন্ন মানুষ যদি দানবীয় শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে পারে, সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমরা ভারতীয়রাও স্বস্তি পাব। যদি তা না হয়, আমাদের এবং এই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে আরও অনেক রক্ত দিতে হবে — সে আজই হোক বা কাল। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মকে পালটে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই।

বলীয়ান। সারা পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব কায়েম করা তার পবিত্র বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে চীন চালু করলো বিআরআই, অর্থাৎ সারা পৃথিবী জুড়ে এক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো। ঠিক যেমনটা আমাদের দেশে ব্রিটিশরা রেল লাইন স্থাপন করেছিল যাতে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার কাঁচামাল প্রথমে রেলপথের মাধ্যমে সমুদ্রবন্দরে এবং সেখান থেকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া যায়। চীন চেয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মতো চীনের কারখানায় শিল্পজাত পণ্যকে সারা পৃথিবীর বাজারে ছড়িয়ে দিতে। তাই, আমরা নিশ্চিন্তে এই উপসংহারে আসতে পারি যে পুজিবাদী অর্থনীতি যেমন হিটলারের জন্ম দিয়েছিল, ঠিক তেমনি কমিউনিস্ট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শি জিং পিং-এর মতো আরেকটা হিটলার জন্ম দিতে চলেছে। বিআরআই নিয়ে আমরা দেখেছি কীভাবে রাশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ... সবাই চোঁ চোঁ করে চীনের পদতলে লুটিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করলো। ঠিক ইংল্যান্ড গোঁফ রাখেননি, রাখলে কী হতো বলা যায় না। ট্রাম্প, আবে, পুতিন ইত্যাদিরা শিজিংপিংকে অনুসরণ করে দাড়ি গোঁফ রাখেননি। কিন্তু মোদীজী বড়ো বেয়াড়া, দাড়ি কামান না, ইদানীং গোঁফটাও কামান না। সুতরাং চীনের রাগ তো হবেই। তাই লেগে গেল গালোয়ানে ধুন্ধুমার। একটা প্রশ্ন উঁকি দেয় যে, চীনের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ সীমান্ত থাকা সত্ত্বেও চীন গালোয়ানকে বেছে নিল কেন? আমি একথা বলছি না যে অরুণাচল প্রদেশের তাউয়াং বা উত্তরাখণ্ডের বাবাবতিতে চীন হামলা করবে না। চীন এটা জানে যে বিশ্বে প্রভুত্ব কায়েম করতে হলে ভারতকে অনুগত বানাতেই হবে। চীনের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের যে ব্লুপ্রিন্ট, তাতে ভারতকে পদানত করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তাই চীনের সীমানায় অবস্থিত দেশসমূহের সঙ্গে ১৪টি ক্ষেত্রে সীমান্ত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ভারতের গালোয়ানকে বেছে নেওয়া হলো।

গালোয়ানকে বেছে নেওয়া কেন?

পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে গোয়াদর সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত যে 'চীন-পাকিস্তান ইকনমিক করিডোর' নির্মাণ করতে চীন ৬০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, তা গিলগিট বাল্টিস্তানের মধ্য দিয়ে গেছে। এই করিডোর বিআরআই-এর অংশ, অর্থাৎ সারা বিশ্বে প্রভুত্ব কায়েমের ক্ষেত্রে এই করিডোরটি চীনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গিলগিট বালটিস্তান জম্মু-কাশ্মীরের অঙ্গ। গত বছর আগস্ট মাসে ভারতের সংসদ ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিবর্তিত করেছে। ফলে, গিলগিট বালটিস্তান সমেত লাদাখের ওপর ভারতের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, ডেপসাং (গালোয়ানের উত্তর) এলাকায় ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ভবিষ্যতে চীন ও পাকিস্তানের যোগাযোগ রক্ষাকারী করিডোরকে বড়ো আশঙ্কাজনক করে তুলবে। তাই রণকৌশলগত প্রশ্নে চীনকে গালোয়ানকে বেছে নিতে হয়েছে। ৫ আগস্ট একটু সতর্ক থাকা দরকার।

তাহলে চীন পিছালো কেন?

চীনের কাছে এটা অকল্পনীয় ছিল যে ভারত অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে সীমান্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য এবং সরঞ্জাম জড়ো করে ফেলবে। ২০২০ যে আর ১৯৬২ নয় এবং ভারতের নেতৃত্ব যে নেহরুর মতো দাড়ি গোঁফ কামানো নেতা বসে নেই, তা চীন একটু দেরিতে হলেও বুঝে ফেলেছে। এছাড়া, আরেকটা বড়ো দিক হলো ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। যখন পৃথিবী দেখলো যে আক্রান্ত হয়েও ২০ জনের বদলা ৪৫ জনে হয় এবং সীমান্তে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী হুংকার দেন, তখন যেন সারা পৃথিবী বল পায়। QUAD-তে অংশীদার করে নেওয়ার জন্য যখন স্কট মরিসন নিজের হাতে তৈরি করা সিঙ্গারার লোভ (ভাড়ামো বলবেন?) মোদীকে দেখায়, তখন চীনের কাছে এর চেয়ে স্পষ্ট বার্তা আর কিছু হতে পারে না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তো বলেই দিলেন যে তারা ভারতকে সামরিক দিক থেকে সাহায্য করবেন। এনমনকী, যে রাশিয়া আর্থিক কারণে চীনের উপর অনেকটা নির্ভর করে, তারাও এই সংকটকালে ভারতকে অস্ত্র জুগিয়েছে। মতাদর্শগত কারণে চীন যতই উগ্র সাম্রাজ্যবাদী হয়ে থাকুক, বাস্তবতা বুঝার ক্ষমতা তার আছে। এছাড়া, ভারতের ওপর আক্রমণ করতে গিয়ে যেভাবে নিজেরাই রক্তাক্ত হয়েছে এবং যেভাবে নিজের দেশের ৪৫ জন বীর সন্তানের জন্য চুপি চুপি শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হয়েছে, তা তাদের দেশের সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। অগত্যা পিছনে ফেরা ছাড়া চীনের আর কোনো বিকল্প রইল না।

তাহলে উপসংহারটা কী?

আগামীতে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমরা একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাব। সোভিয়েত রাশিয়া কমিউনিস্ট শাসিত প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ। ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ১৯৮৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া হয়ে গেল। এর আগেও যখন পূর্ব ইউরোপকে আজ্ঞাবহতে পরিণত করা হচ্ছিল, তখনই কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক উপাদানসমূহ সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় অস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল। আফগানিস্তান আক্রমণ এবং দখলের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট দর্শনের চূড়ান্ত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের যে অপমৃত্যু, তা চীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। সোভিয়েত রাশিয়া যদি আমেরিকা সমেত অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলিকে পরাজিত করতে পারতো, তাহলে বিশ্বমানবতার ত্রাস রূপে সমাজতান্ত্রিক জামা গায়ে দিয়ে আরও কিছুদিন রাশিয়ার সমাজতন্ত্র এই পৃথিবীকে টিকে থাকতো। কিন্তু পারলো না, একটা গুলিও খরচ হয়নি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অমোঘ নিয়মে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশটি নীরবে আত্মহত্যা করলো।

চীনের সভ্যতা অনেক প্রাচীন। ওদের উন্নত সংস্কৃতি এবং গৌরবময় পরম্পরার ইতিহাস আছে। সারা পৃথিবীর সুস্থচেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে এটাই বড়ো আশা। যদি চীনের সুস্থ চেতনাসম্পন্ন মানুষ দানবীয় শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে পারে, সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমরা ভারতীয়রাও স্বস্তি পাব। যদি তা না হয়, আমাদের এবং এই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষকে আরও অনেক রক্ত দিতে হবে — সে আজই হোক বা কালই হোক। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মকে পালটে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। ■

বাংলাদেশে বর্বরতার নতুন নজির

আহমদীয়া শিশুকে কবর থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন, তাদের জায়গা-জমি কেড়ে নেওয়া, মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভেঙে দেওয়া এবং মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করতে বাধ্য করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আহমদীয়া সম্প্রদায় মুসলমান হলেও ধর্মীয় বিশ্বাসে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মতভেদ বা বিশ্বাসের কারণে তারাও ধর্মান্ধ মুসলমানদের রোষের শিকার। আহমদীয়াদের মসজিদ ও বাড়িঘরে প্রায়ই হামলা হয় এবং তাদের অমুসলমান ঘোষণার দাবি ওঠে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মতো তারাও অসহায় অবস্থার শিকার। অথচ বাংলাদেশে তদের সংখ্যা মাত্র এক লক্ষের মতো।

গত ৯ জুলাই এই আহমদীয়া সম্প্রদায়ের এক নবজাতকের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তা বাংলাদেশে নির্যাতনের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমীয়া সম্প্রদায়ের এক নবজাতকের লাশ কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে দেওয়ার ঘটনা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। স্বজনদের অভিযোগ, শিশুটির পরিবার আহমদীয়া সম্প্রদায়ের হওয়াতেই এই অমানবিক কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ বা শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো মামলা দায়ের হয়নি। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন মূলত এই ঘটনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় সাংবাদিকরা জানান, সদর উপজেলার ঘাটুরা গ্রামের বাসিন্দা স্বপ্না আক্তার গত মঙ্গলবার একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। নির্ধারিত সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ শিশুটি ৯ জুলাই ভোরে মারা গেলে সেখানকার সরকারি একটি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই স্বপ্না জানতে পারেন স্থানীয় ধর্মীয় নেতারা মাইকিং করে লোক জড়ো করে তার সন্তানের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে রেখেছে। তিনি অভিযোগ করেন, শুধুমাত্র

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণেই এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

স্বপ্না আক্তার সাংবাদিকদের কাছে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, সরকারি কবরস্থানে সব মুসলমানই তো কবর দিতে পারবে। তিনদিনের বাচ্চা, ওর কোনো অপরাধ নেই, দুনিয়ার কিছুই বোঝে না। তার লাশ ওরা ফেলে দিয়েছে। পুলিশ, মেম্বার, ডিসি (জেলা প্রশাসক), চেয়ারম্যান তাদের কেউ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, একটু সান্ত্বনা দিতে আসেনি। বলেনি যে, যা হয়েছে এটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা, এটা পাপ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরা শাখা জানিয়েছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার সুহিলপুর ইউনিয়নের ঘাটুরা গ্রামের অধিবাসী আব্দুর রাজ্জাকের কন্যা মোছাম্মত স্বপ্না আক্তারের নবজাতক শিশুর তিন দিনের দিন মৃত্যু ঘটলে তাকে ঘাটুরা সরকারি কবরস্থানে দাফন করা হয়। কিন্তু দাফনের কিছুক্ষণ পর উগ্র-ধর্মান্ধরা এই নবজাতক নিষ্পাপ শিশুকে কবর থেকে তুলে রাস্তায় ফেলে রাখে। এই শিশুর অপরাধ সে ঘাটুরা নিবাসী এক আহমদীয়া মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। যদিও পরে প্রশাসনের নির্দেশে মৃত নবজাতকের পরিবারের সদস্যরা কবর থেতে তুলে ফেলা সেই মৃতদেহ নিয়ে দশ কিলোমিটার দূরে অন্য আরেক কবরস্থানে দাফন করে। ঘাটুরায় ঘটে যাওয়া এই পৈশাচিক ঘটনা উগ্র-ধর্মান্ধদের বিকৃত মানসিকতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। কেননা, মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ফিরকা এবং দল-উপদল যেভাবে বাংলাদেশে মুসলমান হিসেবে স্বীকৃত তেমনিভাবে আমরা অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরাও মুসলমান হিসেবে পরিগণ্য। আমাদের কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'। আমরা ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভে বিশ্বাসী ও আমলকারী। একইভাবে আমরা ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাস্সালে বর্ণিত সব বিষয়ে ঈমান রাখি।

মৃতদেহ তুলে ফেলার ঘটনা জানতে পেরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও, তারা কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তবে পুলিশি পাহারায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের কান্দিপাড়ায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নিজস্ব কবরস্থানে শিশুটিকে দাফন করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইসলামি ঐক্যজোটের সম্পাদক মোহাম্মদ এনামুল হক আহমদীয়া সম্প্রদায়কে অমুসলমান আখ্যা দিয়ে এই লাশ তুলে ফেলার ঘটনাকে বিধিসম্মত বলে দাবি করেছেন।

আহমদীয়া মুসলমানদের জামাতের সঙ্গে

অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের তফাৎ বা মতবিরোধ কেবল একটি ভবিষ্যদ্‌বাণীকে কেন্দ্র করে। আহমদীয়ারা বিশ্বাস করেন প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী যথাসময়ে এসে গেছেন আর অন্য মুসলমানরা বিশ্বাস করেন প্রতিশ্রুত ইমাম মাহাদী (আ.) এখনও আসেননি, কিন্তু আসবেন। আহমদীয়া জামাত বলছে, এখন পর্যন্ত আহমদীয়ারা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুসলমান হিসেবেই পরিগণ্য এবং আমরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবেই বিশ্বাস করি। অতএব এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে মুসলমানদের গোরস্তানে বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আহমদীয়া মুসলমানের কবর হবে না একথা সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য।

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে বিভিন্ন জেলায় হামলা ও সামাজিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা। হেফাজতে ইসলাম-সহ সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী বেশ কিছু সংগঠন দাবি জানিয়ে আসছে। তারা বলছে পাকিস্তান যেভাবে আহমদীয়া সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে, সাংবিধানিকভাবে অমুসলমান ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সংগঠনগুলি জোটবদ্ধ হয়ে ঢাকা, রাজশাহী, শেরপুর, নাটোর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল, পঞ্চগড়, গাজীপুর-সহ বিভিন্ন স্থানে আহমদীয়া সম্প্রদায়েরপ ওপর হামলা ও নির্যাতন চালিয়েছে বারবার। তবে সবচেয়ে বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। এই সেই জেলা যেখানে উগ্র মুসলমানরা উপমহাদেশের খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছিল। খান ভারত চলে যাওয়ার আগে এই বাড়িতেই বড়ো হয়েছেন, এখানে তাঁর বিখ্যাত তানপুরা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওস্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি গান করতেন, গান ইসলামে হারাম।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কান্দিপাড়া এলাকায় আহমদীয়া জামাতের বার্ষিক জলসা চলার সময় তাদের একটি মসজিদ এবং আশেপাশের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়েছিল। আহমদীয়া মুসলমান জামাত বাংলাদেশের মুখপাত্র আহমেদ তবশির চৌধুরী বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রচুর কওমি মাদ্রাসা থাকায় এবং হেফাজতে ইসলামের সাংগঠনিক শক্তি বেশি হওয়ায় এ ধরনের একের পর এক হামলা হয়। এ কারণে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা শহরের মূল সমজ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেন। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন ইসলামি দলের মধ্যে যতোই দ্বন্দ্ব থাকুক আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে তারা সবাই এক। ইসলামের নাম ভাঙিয়ে এই গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন সময় ভাঙচুর, লুটপাট, হামলা চালিয়েছে, আহমদীয়া মসজিদ দখল করেছে। পঞ্চগড়ের আহমেদনগরে আহমদীয়া মুসলমান জামাদের বার্ষিক জলসা বন্ধ করা নিয়ে উত্তেজনার মধ্যেই ১৩ ফেব্রুয়ারি তাদের ওপর হামলা চালানো, তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কবর থেকে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের শিশুর মৃতদেহ তুলে ফেলার পৈশাচিক ঘটনার নিন্দা করেছেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি মানবাধিকার নেতা বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ও কেন্দ্রীয় কার্যবাহী পরিষদের সভাপতি লেখক, চলচ্চিত্রনির্মাতা শাহরিয়ার কবির। তারা এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করছি '৭১-এর গণহত্যাকারী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামি এবং তাদের উগ্র মৌলবাদী সহযোগীরা জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদির হত্যা ও সন্ত্রাসের দর্শন বাস্তবায়নের জন্য আহমদীয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর বার বার হামলা চালাচ্ছে, তাদের হত্যা করছে, ঘরবাড়ি ও মসজিদ ধ্বংস করছে, অথচ এসব নৃশংস অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কখনও কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে জাতিসঙ্ঘ-সহ বিভিন্ন ফোরাম থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ ও নিন্দাজ্ঞাপনের পরও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। যার ফলে মওদুদিবাদী, ধর্মব্যবসায়ী, মৌলবাদী দুর্বৃত্তরা করোনাকালের এই ঘোর দুর্দিনে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের একজন হওয়ার কারণে কবর থেকে শিশুর মৃতদেহ তুলে ফেলার মতো ভয়ংকর পৈশাচিক কাণ্ড করতে উৎসাহী হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জোবাইদা নাসরিন বাংলাদেশে ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলে এলেও সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করায় সংখ্যালঘুরা বার বার নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নবজাতক নিয়ে যে অমানবিক ঘটনা ঘটেছে সেখানে প্রশাসন যথাযথ ভূমিকা নেয়নি। কারণ সরকার সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি দলগুলিকে তার রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। এজন্য সরকার সব সম্প্রদায়কে সমানভাবে দেখতে পারছে না। সরকার যখন নীরব থাকে তখন সবাই ধরে নেয় যে এ ধরনের ঘটনা বার বার ঘটানো যাবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-র জন্ম ১৮৩৫ সালে ভারতের পঞ্জাবে। গুরুদাশপুর জেলার কাদিয়ান গ্রামে। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০৮ সালে। আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ সালে। কাদিয়ানেই আহমদীয়া মুসলমানদের সদর দপ্তর। ভারতে প্রায় এক কোটি আহমদীয়া রয়েছেন। আহমদীয়া সম্প্রদায় মনে করে, এই মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহাদী। মাহাদী বলেছেন, আমরা ঈমান রাখি, খোদা তাল্লা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি, ফিরিশতা, হাশর, বিচার দিবস, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি, কুরআন শরীফে আল্লাহ তাল্লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক যা বর্ণিত হয়েছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা আরও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামি শরীয়ত

থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বলে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেইমান এবং ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলল্লাহ'-এর প্রতি ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ থেকে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বলেছে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও ৯ জুলাই বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আস্তিক-নাস্তিক, মুসলমান-অমুসলমান সবার শেষ ঠাঁই খোদার সৃষ্ট এ মাটিতেই হয়। সমস্ত ধর্মীয় মতবিরোধ সত্ত্বেও আল্লাহ 'রাব্বুল আলামীন' জগতসমূহের একমাত্র প্রতিপালক হিসেবে সবাইকে সমভাবে লালনপালন করে থাকেন। বিশ্বাসের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও সবাইকে একই মেঘের পানি দিয়ে তিনি সিঞ্চিত করেন। আস্তিক- নাস্তিক সবাইকে তাঁর সৃষ্ট সূর্য নিজের রোদ সমভাবে প্রদান করে। এই একই কাদামাটিতে সবাই চাষাবাদ করে সমানভাবে উপকৃত হয়। মহান আল্লাহর দয়া ও কৃপার এই সার্বজনীনতা মানুষকে, বিশেষ করে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। আমরাও যেন খোদার গুণে গুণান্বিত হয়ে সবার জন্য উদারতা প্রদর্শন করি।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত আরও বলেছে, তর্কচ্ছলে যদি একথা মেনেও নেওয়া হয়, উগ্র-ধর্মান্ধদের দৃষ্টিতে যেহেতু আহমদীয়ারা অমুসলমান তাই যেখানে তাদের অন্যায় দাপট রয়েছে সেখানে আহমদীয়াদেরকে তারা মুসলমান মানতে নারাজ, সেক্ষেত্রেও ৯ জুলাইয়ের বর্বরতা ও ধৃষ্টতা ধোপে টিকে না। কেননা, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এর বিপরীত সিদ্ধান্ত দিচ্ছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবজাতক ফিতরতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি-উপাসকরূপে রূপান্তরিত করে। ৭২ ঘণ্টার একটি শিশু যার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া হয়েছে তাকে কীভাবে কাফের বলা যেতে পারে? কেননা, মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবজাতক শিশু পুণ্য ফিতরতে (তথা ইসলাম) জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতএব ৭২ ঘণ্টার নিষ্পাপ শিশুকে কোনোমতেই সরকারি গোরস্তানে দাফন হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। মহানবী (সা.)-এর উন্মত্ত হবার দাবিদার উগ্র-ধর্মান্ধরা মুখে মুলমান ও মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারী হবার দাবি করলেও ৯ জুলাইয়ের ঘটনা আবারও সাব্যস্ত করছে, মুখে তারা যাই বলুক বাস্তবে তারা মহানবী (সা.)-এর কথা মান্য করে না। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

অতিথি কলম

ধর্মেন্দ্র প্রধান

সামাজিক মাধ্যমে ছ'কোটি অনুগামীর সংখ্যা ছুঁয়ে মোদী নতুন রেকর্ড করলেন

এই বিপুল তথা ঈর্ষণীয় সংখ্যার বৈদ্যুতিন সর্বাধুনিক ও টুইটার মাধ্যমে অনুরাগীদের সর্বকালীন রেকর্ড তাঁর জনপ্রিয়তার একটি ট্রেলর বা খণ্ডাংশ দেখালেও পুরো গল্পটা বলে না। শুরুতে এটাই বলা ভালো যে নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগ বদল করতে নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যমকে কীভাবে ব্যবহার করেছেন। এটি করতে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিসরে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বিষয়টা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটা বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এই বহু রাজ্যের বিশাল দেশে বহু অঞ্চলেই বিরোধী মতাবলম্বী উগ্রমতবাদী থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনৈতিক চিন্তাধারার মানুষ একই সঙ্গে সহাবস্থান করেন। সেই অনুযায়ী বিচিত্র সমস্যারও উদ্ভব হয়। এগুলিকে সামগ্রিকভাবে সঠিক মনযোগ দিয়ে গরিষ্ঠাংশের কাছে বিশ্বাসযোগ্য সমাধান তুলে ধরা নির্দিষ্ট কুশলতা দাবি করে। তিনি জানেন ও বিশ্বাস করেন একজন যথার্থ নেতাকে সর্বদা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। দায়িত্ব নিতে হয় তাদের ভয় ও আশঙ্কা দূর করার। তাদের কাছে যথা সময়ে পৌঁছে দিতে হয় আশা ও সান্ত্বনার বাণী। একই সঙ্গে দেশের সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে তোলার দায়ও থাকে। তাদের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠে উপযুক্ত পথনির্দেশ দিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বের নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে তাদের পারদর্শী করে তোলাও বড়ো বিষয়। টেকনোলজিকে একেবারে শুরুরদিন থেকেই মোদীর আত্মীকরণের চেষ্টা সর্বজনবিদিত। বিখ্যাত কৃৎকৌশল বিশেষজ্ঞ টমাস ফ্রিডম্যান তাঁর বহুল প্রচারিত The World is Flat গ্রন্থে লিখেছেন, ১১৯২ সাল অবধি মানুষ ই-মেল কথাটা বুঝতই না। এর মাত্র ১০ বছর পরেই পৃথিবীতে টেকনোলজি এমনভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিল যে ই-মেল ছাড়া বিশ্ব নিজের অস্তিত্বই ভাবতে পারল না। টেকনোলজি কী দ্রুত আমাদের জীবনকে অধিকার করে নিল এ থেকে সহজেই বোঝা যায়।

একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নেতৃত্বকে সর্বদা জাতির কাছে দায়বদ্ধ ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগের নিরসনের সঙ্গী হয়ে থাকতে হয়। মোদী গোরাতেই এই দায়িত্বগুলি সামলাতে টেকনোলজি কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে তা উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতের গণতন্ত্র যে রাজ্যগুলির সঙ্গে পারস্পরিক (কেন্দ্র-রাজ্য) অংশগ্রহণকারী একটি ব্যবস্থা, এটা তাঁর চেয়ে কেউ বেশি জানে না।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই নাগরিকদের কাছে দায়বদ্ধ থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে তিনি টেকনোলজিকে ব্যবহার করছেন। আধুনিক পৃথিবীতে কেবল মাথার ছাত, পেটের খাবার আর জল পেলেই মানুষের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় না। এর মোটা অর্থ ছিল গরিব ও ধনী। এমন তো নয় এখন নাগরিকদের মধ্যে নানা বিভাগ, উপবিভাগ অবস্থান করছে। এদের চাহিদা, বিচিত্র প্রয়োজন ও দাবির কথা না শুনে উপায় নেই। এমন অনেক বিষয় আছে যা শিশু, উভয়লিঙ্গ সম্প্রদায়, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের পেশাদার, বাড়ির গৃহিণী ও এমন বহু কাজে নিযুক্ত মানুষ আছেন যারা নির্দিষ্ট করে ক্ষেত্রের নামকরণ দ্বারা চিহ্নিত হতে চান না। যোগাযোগ, বিশেষ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের পূর্ণ স্বাধিকারের ফলে সামাজিক মাধ্যমে এমন বিষয় নেই যা নিয়ে বিতর্ক আছড়ে পড়ছে না।

এগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়ছে সরকার। সামাজিক মাধ্যমে যে অন্যায় বা অবিচার সংঘটিত হওয়ার কথা বহুক্ষেত্রে উঠে আসছে তার নিরসনে সরকারের দায়বদ্ধতা এসে পড়ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এই ধরনের সমস্যাগুলির সমাধানে মোদী অত্যন্ত উদ্যোগী ও সদর্থক ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব টুইটার হ্যান্ডেলের মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের অজস্র ভাষায় নিজের মতো করে অত্যন্ত পরিশীলিত বা ক্ষেত্রবিশেষে নিতান্ত সহজবোধ্য ভাষায়

প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া, উপশমের কৌশল নিত্যদিন দিয়ে চলেছেন। এককথায় তিনি সফলভাবে দেশবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

তিনি টেকনোলজিকে জাতিগঠনের কাজে লাগাবার উদ্যোগ নিয়েছেন। একইসঙ্গে তা প্রশাসন চালানোর মাধ্যম হিসেবেও প্রয়োগ করছেন। করোনা মহামারীর সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটটি এই সূত্রে ভালো উদাহরণ হতে পারে। একইসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী দাঙ্গাহাঙ্গামা, ভৌগোলিক ভাবে সব দেশগুলিকেই পারস্পরিক যোগাযোগ জারি রাখতে এক ধরনের বহুমাত্রিক সংযোগ কৌশলের ভাগীদার হতে হয়েছে। আজকের বিশ্বে জাতীয় নেতৃত্বকে সরাসরি নাগরিকদের মতের অংশীদার হওয়ার যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে— অতীতে তা কখনও দেখা যায়নি। ভারতের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে দুঃস্থ বা অভাবী লোকটির কাছে সরাসরি পৌঁছে গেছেন। হাতের কাছে উদাহরণ হিসেবে লকডাউন প্রথম জারি হওয়ার সময় দেশের মানুষ যখন হতাশাগ্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল বাধ্য হয়েছিল, নিজের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে এমনই সময়ে মোদী ঘরে ঘরে যে কোনো ধরনের দিয়া বা বাতি জ্বালাবার আহ্বান জানিয়ে এই বার্তাই দিয়েছিলেন, 'আতঙ্কিত হবেন না আমরা সকলেই এক ও ঐক্যবদ্ধ'। এই একটিমাত্র ছোট্ট কাজের মাধ্যমেই তিনি এক লহমায় ১৩০ কোটি ভারতবাসীকে একসূত্রে বেঁধে ফেলেছিলেন।

দেশের মানুষের সর্ববিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে তিনি টেকনোলজির প্রয়োগ করেছেন। আমরা সচারাচর সর্বোচ্চ নেতাদের জনগণের ছোটোখাটো প্রাত্যহিক বিষয়গুলি আলোচনা করতে দেখি না। মোদী কিন্তু ব্যতিক্রম। ২০১৪ সালে ১৫ আগস্ট একেবারে শুরুর লগ্নেই তিনি মানুষকে রাস্তায় জঞ্জাল ছুঁড়ে ফেলা থেকে থুতু ফেলতে বারণ করেছিলেন। স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর যোগাভ্যাসের পরামর্শ আজ সমগ্র বিশ্ববাসী গ্রহণ করেছে। তাঁকে মান্যতা দিয়ে ২১ জুন 'বিশ্ব যোগ দিবস' হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। দেশের মানুষদের মধ্যে যারা কোনো অজানা প্রান্তে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন বা আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠার মতো কাজ করেছেন তিনি তাদের জাতির সামনে উপস্থাপিত করেছেন। অপরিচয়ের অন্ধকারে গুটিয়ে থাকা প্রতিভাবান বা মানুষের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় তার মঙ্গলে ঝাঁপিয়ে পড়া এযাবৎ অজ্ঞাত মানুষের অবদান নতুন আবিষ্কার তিনি সর্বসমক্ষে সম্মানে তুলে ধরেছেন। এসবই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে গিয়ে জাতিকে ও তার তরুণ সমাজকে উজ্জীবিত করেছে।

সবশেষে, চরম লক্ষ্য হিসেবে তিনি টেকনোলজিকে শান্তি ও সর্বাঙ্গীণ সংহতি রক্ষায় ব্যবহার করেছেন। আমাদের দেশের এই বিশাল আয়তন ও ততোধিক জনসংখ্যার প্রাবল্য সবসময়ই যে কোনো বড়ো কর্মকাণ্ডের সাফল্যের ক্ষেত্রে ফাঁকফোকর তৈরি করে বিরোধিতার পরিসর তৈরি করে। কিন্তু যখন দেশের সর্বোচ্চ নেতাটি নিজেই সরাসরি জনগণের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করেন, তাদের অভিযোগের কথা শোনেন তখন পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা অনেক সহজ হয়ে যায়। এসে যায় দ্রুত সমাধান।

এক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'টুইটারের' কথা বললে সব বলা হবে না। জনতার সমস্যার হাল করতে এমন কোনো সামাজিক বৈদ্যুতিন মাধ্যম নেই যার সফল ব্যবহার তিনি করেননি। তাঁর বক্তব্যকে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার প্রান্তিক মানুষটির কাছে পৌছে দিতে তিনি চিরাচরিত রেডিয়োকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই বছরের জুন মাসের ২৮ তারিখ অবধি ৬৬টি 'মন কী বাত'-এর পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পরও এটি দেশবাসীর কাছে অন্যতম জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান। মানুষ মাসের শেষ রবিবারটির দিকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা কথা শুনতে।

অর্থনীতি থেকে স্বচ্ছ ভারত, স্বাস্থ্য থেকে আধ্যাত্মিকতা, এমনকী বিদ্যার্থীদের জন্য পরীক্ষার ভয় কাটানোর নিদান সমেত কী থাকে না এতে। এই 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে মোদী মানুষের কাছে তাঁর হৃদয় উজাড় করে দেন। সাদরে তাঁদের অংশগ্রহণে ডেকে নেন।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের অধিকারী হিসেবে গর্ব করা মানুষদের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে তিনি নাগরিকদের সঙ্গী হয়ে থাকতে নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করেন। তাঁর টুইটার অনুগামীর সংখ্যায় রেকর্ডভাঙা বৃদ্ধি তাঁর দায়বদ্ধতা ও নিপুণ নেতৃত্বের ৬ বছর ধরে প্রবহমান একটি প্রমাণ মাত্র।

(লেখক পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও ইস্পাত মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)

লোকান্তরিত হলেন প্রবীণ স্বয়ংসেবক শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

বঙ্গপ্রদেশের প্রবীণ স্বয়ংসেবক শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ গত ২২ জুলাই লোকান্তরিত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। রেখে গেলেন সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ১ কন্যা, নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন।

১৯২৬ সালে নবদ্বীপ ধামে তাঁর জন্ম। ১৯৪৩ সালে নবদ্বীপের বিস্তারক কালিদাস বসুর হাত ধরে স্বয়ংসেবক হন। ১৯৪৫ সালে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ করেন। কলেজে পড়ার জন্য খুলনা গিয়ে সঙ্ঘের শাখা শুরু করেন। পড়াশোনা শেষে তিনি দীর্ঘদিন সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের ময়মনসিংহে তিনি প্রথম প্রচারক হিসেবে যান। বীরভূম জেলা প্রচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালে বাড়ি ফিরে এসে উচ্চপদের সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। গৃহী কাযকর্তা হিসেবেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজ বৃদ্ধিতে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ, সহ প্রান্ত কার্যবাহ, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি ইত্যাদি দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে নির্বাহ করেছেন। গৃহী জীবনে তিনি শেওড়াফুলিতে থাকতেন। শেওড়াফুলি নগরের স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি 'জ্যেঠু' হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

লকডাউন শুরুর আগে তিনি আসানসোলে ছেলের বাড়ি যান। ফুসফুসে সংক্রমণ ও জন্ডিস নিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হন। সেখানেই তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়।

জওহরলাল নেহরু এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

১৯৫৬ সালে তারাশঙ্কর তাঁর বিখ্যাত 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান এবং পুরস্কারটি তারাশঙ্করের হাতে তুলে দেন জওহরলাল নেহরু।

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আমলে সাহিত্যিক হিসেবেই তারাশঙ্কর বাংলাদেশ, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তথা ভারতধর্ম ও ভারত-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৫৬ সালে চীনা সাহিত্যিক লু-সুনের বিংশতিতম মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে আহূত পৃথিবীর অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে তারাশঙ্করের নাম মনোনীত করেন। সেবার তারাশঙ্কর চীনের পথে রওনা দিয়েও শারীরিক অসুস্থতার কারণে রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসেন। দ্বিতীয় বারের নিমন্ত্রণে, ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর তিনি চীন যাত্রা করেন। তারাশঙ্করের চীন ভ্রমণ তাঁর আন্তর্জাতিক সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় বহন করে। কিন্তু স্মরণীয় যে তারাশঙ্কর গান্ধীপন্থী, আর চীন মার্কসপন্থী। গান্ধীপন্থী তারাশঙ্করের মার্কসপন্থী চীনভ্রমণ বেশ বিস্ময়কর। মনে রাখতে হবে, চীন ভ্রমণে গান্ধীপন্থী ও মার্কসপন্থী দুই ভিন্ন মতাদর্শকে অতিক্রম করে তারাশঙ্কর একজন ভারতপন্থী হয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে সেবার চীনের সাহিত্য বাসরে তাঁর অভিমত ছিল— "আমি আমার ভারতধর্মে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি মানুষের যাত্রা কল্যাণপথে। তার মধ্যে অকল্যাণ যেখানে দেখা দেবে— সেখানেই মানুষ নিজেই তাকে সংশোধন করবে। চীনও করবে।

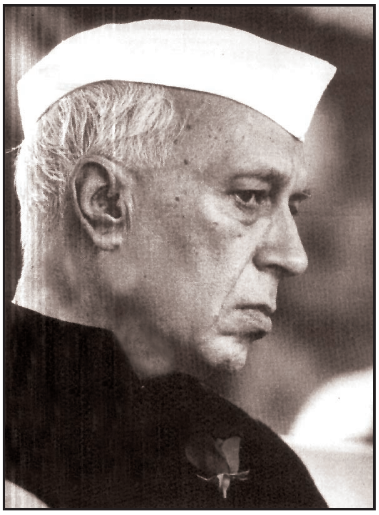

ভারতও করবে।" মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিজীবনে গান্ধীপন্থী তারাশঙ্করের মধ্যে কোনোরূপ সংকীর্ণতা ছিল না। জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক তারাশঙ্কর গান্ধীবাদী হয়েও মার্কসবাদের কল্যাণময় দিকটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, হয়তো-বা মার্কসবাদকেও সংশোধনের মধ্য দিয়ে জাতীয় কল্যাণের পথে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় 'অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স কনফারেন্স'। সেই কনফারেন্সে ভারতীয় সাহিত্যিক দলের নেতা নির্বাচন করা হয় তারাশঙ্করকে। সেখানে প্রস্তুতি কমিটির মিটিংয়ে যাওয়ার আগে তারাশঙ্কর নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও দেখা পাননি, একটি চিঠি লিখে গিয়েছিলেন তিনি। এর আগে ১৯৫৫ সালে বান্দুংয়ে অনুষ্ঠিত অ্যাফ্রো-এশিয়ান সম্মেলনে নেহরু অংশগ্রহণ করেন। সেই সম্মেলনে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, মানবাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্ব শান্তি ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সেই সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘের ১০ দফা 'বিশ্ব শান্তি ও সহযোগিতা প্রচার

ঘোষণা' এবং নেহরুজীর বিশেষ পাঁচদফা নীতি (অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, একে অপরের বিরুদ্ধে অনাক্রমণ, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান) সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৫৮ সালে 'অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স কনফারেন্স' সম্পর্কে তারাশঙ্করের পত্রোত্তরে ২৩ জুন ১৯৫৮ নেহরুজী সম্মেলন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে তারাশঙ্করকে লেখেন—

"I have little doubt that the Soviet writers would like to deal with this matter on the literary level and not to bring in politics. But sometimes, inspire of their wishes, politics creep in."

এই চিঠি পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই তারাশঙ্কর দিল্লি গিয়ে নেহরুর সঙ্গে দেখা করে বলেন, তিনি নিজেই ডেলিগেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। নেহরুজী খুশি হন, বলেন,

তুমি সভ্য হিসেবে যাকে নিয়ে যাবে— সে পাশপোর্ট পাবে; কিন্তু সোভিয়েত সীমান্ত পর্যন্ত আপন আপন ভাড়া দিয়ে যেতে হবে। নেহরুজীর কথায় রাজি হয়েছিলেন তারাশঙ্কর। তিনি নিজে, জনাব সাজাদ জহির, প্রবোধ সান্যাল, মুলুকরাজ আনন্দ প্রমুখ প্রতিনিধিরা দফায় দফায় রাশিয়ার তাসকন্দে পৌঁছোন। তার আগে সম্মেলন কমিটির কাজকর্ম করার জন্য সব দেশ থেকে দু'জন তিনজন করে প্রতিনিধি সেখানে হাজির হয়েছিলেন। ভারত থেকে গিয়েছিলে কলকাতার গোপাল হালদার এবং পঞ্জাবের শ্রীসেঁখো। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন ওখানে তাদের নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে গবেষণামূলক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইউরোপ থেকে এসেছিলেন কৃষ্ণলাল শ্রীধরাণী।

মূল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল অক্টোবর মাসে। সম্মেলনে রুক্ষ-কঠোর-তিক্ততার এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারাশঙ্কর। সাহিত্য সম্মেলনের নামে তাসকন্দ মঞ্চে যে রণক্ষেত্র তৈরি হয়— তারাশঙ্কর সেখানে ছিলেন একক প্রতিপক্ষ যোদ্ধা। সম্মেলন শেষে তাঁর ভাগ্যে কী জুটবে এই আশঙ্কায় প্রথম থেকেই তিনি সতর্ক এমনকী অবহিতও ছিলেন। পরিস্থিতি বুঝে সম্মেলন শেষ হওয়ার দিনই ভোরে তিনি দিল্লির পথে রওনা দেন। ফিরে এসে সম্মেলন সম্পর্কে একটি রিপোর্ট-সহ তাঁর অভিজ্ঞতা ও অভিমতের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তারাশঙ্কর লিখেছিলেন—

''আপনার পত্রের একটি লাইন উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছিলেন (৫ জুন, '৫৮), I have little doubt the Soviet writers with like to deal with this matter on the litterary level and not to brings in politics. But sometimes, inspite of their wishes, politics creep in.

রিপোর্ট দেখিবেন তাহাই সত্য হইয়াছিল। তবে আমরা, আমি (ভারতীয় দলের নেতা) ও ড. আনন্দ (সহকারী) দুইজনে দলের সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের ভারতীয় জীবনধর্মকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছি। সমগ্র সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গের উগ্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমরা স্তব্ধ বা নিরুৎসাহিত হই নাই এবং শেষ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতেও সক্ষম হইয়াছিলাম। সম্মেলনের শেষে একটি স্থায়ী সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াও ইহাতে বাধা দিতে পারি নাই। তবে এইটুকু করিয়াছি যে ভারতবর্ষ এখনও তাহার সভ্য হয় নাই। ...এখন ইহা অ্যাকাডেমির উপর নির্ভর করিতেছে। তবে আমি মনে করি যে অ্যাকাডেমি সভ্য প্রেরণে বিরত থাকিলে ভুল করিবে'।"

রিপোর্ট-সহ চিঠিতে তারাশঙ্করের এই অভিমত নেহরুজীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। পত্রোত্তরে ৫ নভেম্বর তিনি তারাশঙ্করকে লেখেন,

"I have read your report as well as the appeal issued by the Conference and your speech with great interest.

The question of the Sahitya Academy agreeing to join the new permanent Council will have to be considered by us carefully."

মনে রাখতে হবে, তাসকন্দ সম্মেলনের জের সহজে মেটেনি। কাগজে কলমে অনেকদিন ধরে এর জের চলে। এখানকার বাংলা কাগজে তাসকন্দের বিষয় নিয়ে কতকগুলি চিঠি প্রকাশিত হয়। যাঁরা লিখতেন তাঁরা মস্কো নিবাসী বাঙ্গালিদের কেউ। তাঁরা অধ্যাপনা অথবা বই অনুবাদের কাজে মস্কোতে থাকতেন। তাঁরা তাসকন্দ সম্মেলনে প্রবেশাধিকার পাননি, মস্কোর কাগজ পড়ে অথবা লেখকসঙ্ঘ মারফত খবর শুনে এখানকার কাগজে চিঠি লিখতেন। চিঠিগুলি ভারতবর্ষের বিপক্ষে ছিল। (সেইসব চিঠির উত্তর উপযুক্ত জবাব দিয়ে ৯ নভেম্বর ১৯৫৮ 'মস্কোর চিঠি সম্পর্কে কয়েকটি কথা' শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' তারাশঙ্কর একটি চিঠি লেখেন। আমরা কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে সেই সময়ের আনন্দবাজার পত্রিকা অনুসন্ধান করে সেই চিঠি দেখার সুযোগ পেয়েছি)। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যপ্রদেশেও ওই সম্মেলনে তারাশঙ্করের ভূমিকা বিষয়ে নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই হয়। ডাঃ কৃষ্ণলাল শ্রীধরাণী কয়েকটি মিটিং ডেকে তাসকন্দের বিবরণ বর্ণনা করেন। একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণন। পরে ভুবনেশ্বরে 'পেন'-এর রজতজয়ন্তী উৎসবে একটি চায়ের আসরে তিনি তারাশঙ্করকে ডেকে তাসকন্দের ঘটনা আনুপূর্বিক শোনেন। চায়ের আসরে হরেকৃষ্ণ মহাতাপ প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে জওহরলাল নেহরুও উপস্থিত ছিলেন। রাশিয়া সম্মেলনে আন্তর্জাতিক ভারতযোদ্ধা তারাশঙ্করের কৃতিত্বে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন নেহরুজী। এর কিছুদিনের মধ্যেই তারাশঙ্করকে তিনি রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত করেন।

দিল্লির সিংহাসনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলাল নেহরুর অবস্থান ছিল— ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ সালে মে মাস পর্যন্ত। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৬০ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৬ সালের মার্চ পর্যন্ত তারাশঙ্কর ভারত সরকারের রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৬০ সালের ৩১ মার্চ রেডিয়োতে ঘোষণাবাণী শুনতে পান, 'মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যসভার একজন সভ্য হিসেবে মনোনীত করেছেন'। 'আমার কথা' বইতে এই 'বেতারবাণী'র কথা লেখার সঙ্গে সঙ্গে তারাশঙ্কর আরও বলেছেন, 'প্রত্যক্ষ সংবাদ অবশ্য পূর্ব থেকেই জানতে পেরেছিলাম আমি'। ঘটনাটির সংবাদ এর আগেই মাদ্রাজ থেকে ফেরার সময় প্লেনে ভাইসচ্যান্সেলর নির্মল সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন। এর আভাস পেয়েছিলেন আরও আগে। তারাশঙ্কর তখন পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য। সে সময় একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁকে ভোটে

দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন।

উত্তরে তারাশঙ্কর নেহরুকে জানান— আমি ব্রাহ্মণ, জ্ঞানাবধি মাথা উঁচু করে এসেছি, এই বৃদ্ধ বয়সে আর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে পারব না। তখন নেহরু বলেছিলেন— ভিক্ষা করতে হবে না। তুমি এমপি হও। এই সব মূল্যবান কথাবার্তা তারাশঙ্কর তাঁর লাভপুরের বন্ধু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন। রাজ্যসভার সদস্য তারাশঙ্কর পার্লামেন্টে ড. রাধাকৃষ্ণন ও জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি অধিক আকৃষ্ট হতেন। নানান সূত্রে পার্লামেন্টে স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা প্রকাশে বাঙ্গালি হিসেবে গর্ববোধ করতেন তিনি। নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বে রাজ্যসভার অন্দরমহলের অভিজ্ঞতা বিষয়ে তারাশঙ্করের একটি দুটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরেও তারাশঙ্কর দিল্লিতে ছিলেন। ১৩-১২-৬০ তারিখে স্ত্রীকে পত্রে লিখেছেন, ''খুব সর্দি হয়েছে। বাড়িতে বসে আছি, পার্লামেন্টে যাইনি, শরীর খারাপ। বেরুবাড়ি নিয়ে মন অশান্ত। তিল তাল হয়ে উঠেছে। মোটামুটি ঠিক করেছি— এই বেরুবাড়ির ব্যাপারে নীরব থাকব। কোনো অংশগ্রহণ করব না''। ওই একই ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৬ এপ্রিল পুত্র সনৎকুমারকে তিনি লিখছেন—

''বেরুবাড়ি প্রশ্ন মনকে অত্যন্ত নাড়া দিচ্ছে। এর মূলে পণ্ডিতজীর দোষ বা ত্রুটি এক আনা বা দুআনা, বাকিটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের। এখানে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস এমপিদের মিটিং হচ্ছে ঘন ঘন। সব বিবরণ জ্ঞাত হলাম। তাঁরা চালাকি করে যে প্রশ্নটা হয়তো-বা আসলে সামান্য প্রশ্ন ছিল কিন্তু আজ তা তাঁদেরই চালাকিমূলক সমর্থনে অসামান্য হয়ে উঠেছে। এখানকার বামপন্থীরা সুযোগ পেয়ে তাকে দানবে পরিণত করতে চাচ্ছেন। বিধানসভা বিধান পরিষদের বিবরণ রেডিয়োতে শুনছি, কাগজে দেখছি। আজ ১৬। হরতালের পরিণতি কী হবে অনুমান করতে পারছি না। সমস্ত জেনে ও শুনে আমার মনে হচ্ছে যে, বেরুবাড়ি সম্পর্কে আমি নিজেকে সংস্পর্শহীন রাখতে বাধ্য। এমপিরা বক্তৃতায় বিরোধিতা করবেন এবং ভোটের সময় ভোট দেবেন। আমি তা পারি না পারব না। ...জানুয়ারি মাসেই কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির পদত্যাগ করব। এ না করলে আর উপায় নেই।''

আমরা জানি, ছিটমহল তথা বেরুবাড়ি সমস্যা নিয়ে ১৯৫৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন সীমান্ত সমস্যা সমাধানে একটি চুক্তি করেন। এটি 'নেহরু-নুন'-চুক্তি হিসেবে পরিচিতি পায়। চুক্তি অনুযায়ী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরের বেরুবাড়ির উত্তর দিকের অর্ধেক অংশ ভারত এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশ ও এর সংলগ্ন এলাকা পাবে পূর্ব পাকিস্তান। এর আওতায় বেরুবাড়ির সীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ভারত এগিয়ে না আসায় তা মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে বেরুবাড়ির দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশ ও এর ছিটমহলের সুরাহা হয়নি। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

দ্বিশততম জন্মবর্ষে অক্ষয় কুমার দত্ত

অনু বর্মণ

গ্রাম্য পাঠশালায় বিঘা কালির অঙ্ক কষতে কষতে এক বালকের মনে জেগেছিল এক ‘জ্যোতির্ময়’ প্রশ্ন— আচ্ছা পৃথিবীটার কালি কত? ওটা কত বড়ো? তার শেষ সীমাই বা কোথায়? এই বালকই অক্ষয়কুমার দত্ত। জ্ঞানতাপস যার বিশ্লেষণবোধে যিনি এই জগতকে নির্লিপ্তভাবে দেখার অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবজাগরণ যুগের অন্যতম প্রবর্তক অক্ষয় কুমার দত্ত। তিনি একাধারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কর্মী পুরুষ। অক্ষয় কুমার ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপাসক, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বুদ্ধিমান মানুষ। সমকালীন বিশ্ব মানসিকতা তাঁর মধ্যে সংকলিত হয়েছিল। অগাস্ট কোঁতের প্রত্যক্ষতাবাদ ও মানবতার আদর্শ, বেন্থাম-মিলের হিতবাদ বা উপযোগাত্মকতা, এমনকী হারবার্ট স্পেনসরের সংশয় বা অজ্ঞেয়তাবাদ পর্যন্ত তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত হয়েছিল। ধর্ম, নীতি, সমাজ এবং সমসাময়িক অন্যান্য প্রশ্নগুলিকে তিনি প্রত্যক্ষতা এবং উপযোগের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এমনকী প্রার্থনার যৌক্তিকতাকেও তিনি গাণিতিক অভ্রান্ততায় অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে কৃষক শস্য লাভ করে পরিশ্রমে, জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা দ্বারা নয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা থেকে তিনি ছিলেন বহু দূরে । তিনি বলেছিলেন, ‘অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র’।

অক্ষয় কুমার দত্তের জন্ম আঠারোশো কুড়ি সালের ১৫ জুলাই, নবদ্বীপের পাঁচ মাইল উত্তরে চুপী গ্রামে। পিতা পীতাম্বর দত্ত ছিলেন কলকাতার কুঁদঘাটের পুলিশ কার্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষ। মাতা দয়াময়ী দেবী। কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বছর দুই পড়ার পরেই অক্ষয় কুমারের পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে তাকে অর্থোপার্জনে উদ্যোগী হতে হয়। তবুও সারাজীবনই তিনি পড়াশোনা করে গেছেন। কালক্রমে বিবিধ বিষয় এবং ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশীয় ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কিশোর বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় এবং হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ‘অনঙ্গমোহন’ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

১৮৩৮ সালে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরিচয় হয়। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাকে ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করেন। এই পত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখির সূত্র ধরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা চালু হলে তিনি তার সভ্য হন। ১৮৪০ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক হয়ে অক্ষয় কুমার দত্ত পড়াতেন ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা। এই সময় অক্ষয় কুমার বাংলাভাষায় ‘ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা’ নামে দুটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ১৮৪১ সালে তাঁর লিখিত ভূগোল বাংলাভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রথম বই। এই বইয়ের মধ্য দিয়েই বাংলাভাষায় প্রথম যতি চিহ্নের প্রবর্তন ঘটান অক্ষয় কুমার।

অক্ষয় কুমার দত্তের হাত ধরেই বাংলাভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্য সাবালকত্ব লাভ করে। বিজ্ঞান ও ভূগোলের অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ তৈরি করেছিলেন অক্ষয় কুমার। অনুবীক্ষণ, জ্যোতির্বিদ্যা, চুম্বক, দাহ্য পদার্থ, তড়িৎ, পরিমিতি, জড়, জোয়ার, রামধনু, ধ্রুবতারা, মাধ্যাকর্ষণ, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, অঙ্গার, বাষ্প, বজ্র, সৌরজগৎ, মানমন্দির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি তাঁরই তৈরি করা বাংলা শব্দ।

পাশ্চাত্য বেকনীয় দর্শনের অন্যতম গুণগ্রাহী অক্ষয় কুমার দত্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৮৪২ সালের জুন মাসে প্রসন্ন কুমার ঘোষের সহায়তায় ‘বিদ্যাদর্শন’ নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালির মননকে বিজ্ঞান চেতনায় সমৃদ্ধ করা।

১৮৪৮ সালে জানুয়ারি মাস থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রিটিশ ফ্রেনোলজিস্ট জর্জ কুম্ব-এর ‘দ্য কনস্টিটিউশন অব ম্যান কনসিডারড্ ইন রিলেশন অব এক্সটার্নাল অবজেক্ট’ পুস্তকের ভাবধারায় ভারতীয় প্রেক্ষিতে তাঁর লেখা ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ প্রকাশিত হতে থাকে। পরে দু’খণ্ডে বই আকারে তা প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ ১৮৫২ এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগে প্রাকৃতিক নিয়ম, মানুষের শারীরবৃত্তি, মানসবৃত্তি ও জীবনযাত্রার নীতি পদ্ধতি আলোচনা করে অক্ষয় কুমার নিরামিষ ভোজনের সুফল ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে ধর্ম, সামাজিক নিয়ম, সুরাপানের কুফল— এসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই বইটিকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরে কালিপাড়া স্কুলে আগুন লাগাতে চেয়েছিল কিছু লোক। কারণ সেই বইয়ে অক্ষম কুমার দত্ত লিখেছেন, বিবাহের পূর্বে দম্পতি ভালোভাবে আলাপ

পরিচয় করে নেবে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশি থাকবে না, সংসারে নারী ও পুরুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমান, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের সমাধান না হলে বিবাহ বিচ্ছেদই কাম্য। কালীপাড়া স্কুলের উঁচু ক্লাসের কিছু ছাত্র সভা করে ঘোষণা করে বিবাহ সম্পর্কিত এইসব নিয়ম তাঁরা মেনে চলবে। ধর্মান্ধ রক্ষণশীল মহলে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ক্ষোভ। তবু অক্ষয় কুমার দত্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সারাজীবন ধরে লড়াই করে গেছেন।

'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' অক্ষয় কুমার দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, 'বিষয় গৌরবে ও লিপিকুশলতায় সত্যই তা মাস্টারপিস (বাংলা সাহিত্যে গদ্য, পৃষ্ঠা-৭৮)। এই গ্রন্থে লেখকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, সত্যনিষ্ঠা, বিচারভঙ্গি, অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান এবং গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'চারুপাঠ' গ্রন্থটি (তিনটি খণ্ড) সেকালে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' (১৯০১)। মাতৃভূমি থেকে যাবতীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কদাচার ও দুর্বলতা দূর করাই ছিল অক্ষয় কুমার দত্তের ব্রত। উদ্ভিদ প্রেমিক অক্ষয় কুমার দত্ত বাড়ির লাগোয়া জমিতে তৈরি করেছিলেন 'শোভনোদ্যান'। ৩৮ রকমের বৃক্ষ, ১৫ রকমের ফুলগাছ, ১৬ রকমের মসলাজাতীয় গাছের কথা পাওয়া যায় এই উদ্যানকে কেন্দ্র করে। বাড়ির ভেতরে ছিল ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। বিদ্যাসাগর এই উদ্যানের নাম দিয়েছিলেন 'চারুপাঠ চতুর্থ'।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কঠোর নীতিপরায়ণ, বিনয়ী, ধার্মিক এবং দরিদ্রদের প্রতি দয়াশীল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থই বলেছেন— 'তিনিই বাঙ্গালির সর্বপ্রথম নীতি শিক্ষক'। নিজের উপার্জনের সব টাকায় তিনি বাঙ্গলায় বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তোলার কাজে নিঃস্বার্থে দান করেছিলেন। মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণার কেন্দ্র রূপে তাঁর অকৃত্রিম দানেই গড়ে উঠেছিল আজকের 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স'।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে বুদ্ধির, বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রজ্ঞার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর রচনায়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক সংযোগ। তাঁর শয়নশিখরে থাকতো ডারউইন ও নিউটনের প্রতিকৃতি। ঘরের দেওয়ালে থাকতো জ্যোতিষ্ক-লেখা গগনপট, নরকঙ্কাল ও পশুপঞ্জর (জাস্টিস সদাচরণ মিত্রের ভাদ্র ১৩১২ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে প্রদত্ত বিবরণ)। ধর্মতত্ত্ব থেকে ভাষাবিজ্ঞান পর্যন্ত যে দীর্ঘপ্রকার জ্ঞানভূমির মধ্যে ছিল তাঁর অনায়াস পদচারণা, বাঙ্গালি পাঠককে হাতে ধরে সেই জ্ঞানজগতের সিংহদ্বারে তিনিই পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর কাছে আধুনিক ভারতবাসীর ঋণ অপরিশোধ্য। ১৮৮৬-এর ২৮ মে ৬৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন তিনি। তাঁর পৌত্র ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বয়স তখন মাত্র চার। পরবর্তীকালে পিতামহকে 'হোমশিখা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বঙ্গীয় গদ্যের গৌরব স্থল/আমার পূজ্যপাদ পিতামহ...।" কুসংস্কার মুক্ত ভারত গঠনে আজও অক্ষয় কুমার দত্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর দ্বিশত জন্মবর্ষে জানাই অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং প্রণাম।

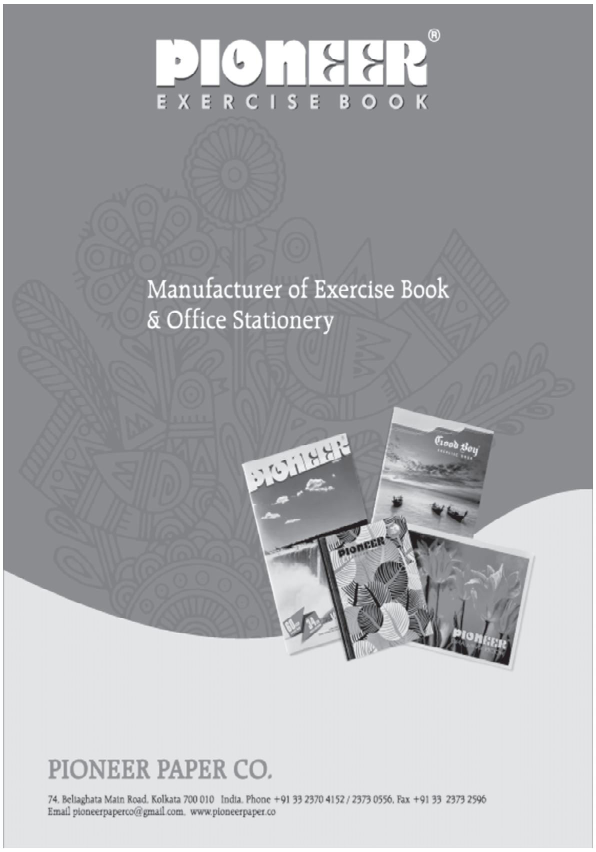

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বড়ো সোহাগের মা আমার

সারদা সরকার

আমি মহাকাল। মহাপৃথিবী শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্ম। মানবসভ্যতার অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই তিনটি কালেই আমার বিস্তার। তাই সসাগরা ধরণীতে নদীর মতো বয়ে চলাই আমার ধর্ম। কারুর জন্য অপেক্ষা করা আমার কাজ নয়। কিন্তু আজ আমি পুরনো কলকাতার বাগবাজারে একটি বাড়িতে স্বয়ং নারায়ণী লক্ষ্মীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আছি। এই কাহিনির পটভূমিকা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতকের শুরুর দিকের পরাধীন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতার। আমার ও আয়ারল্যান্ড থেকে আসা বিদেশিনী কন্যা মিস মার্গারেট নোবেলের মধ্যে বসে রয়েছেন অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা। সঙ্ঘজননী সারদা মায়ের আশীর্বাদে বদলে গিয়েছিল মার্গারেট নোবেলের মতো আরও অনেক জীবন।

সেদিন ১৭ মার্চ, ১৮৯৮ সাল। মা দু'তিনদিন হলো জয়রামবাটি থেকে কলকাতায় এসেছেন। তিন বিদেশিনী ভক্তকে নিয়ে স্বামীজী আসছেন মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। মার্গারেট নোবেল, জোসেফিন ম্যাকলয়েড ও সারাবুল। স্বামীজী ও অন্য গুরুভাইরা একটু চিন্তায় আছেন— মা কেমনভাবে এই বিধর্মী মেয়েদের দেখবেন, আপন করে নেবেন নাকি দূরে সরিয়ে রাখবেন? বাগবাজারের অন্ধকার সংকীর্ণ গলিতে তখনও তেমন উদারতার ছোঁয়া লাগেনি। ধর্মাধর্ম, ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতপাতের বাইরে বেরোয়নি সেই উনিশ শতকের মানুষগুলো।

ওই, ওই তো একটা গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। হইহই করে দৌড়ে এল পাড়ার কুচোকাঁচা থেকে বুড়োবুড়ি সবাই। গাড়িটা ঘিরে ফেলেছে সকলে। তিনজন মেমসাহেব নামল গাড়ি থেকে। মায়ের বাড়ির দরজা আধখোলা। ভিতর থেকে যেন একটু চাপা গুনগুনানি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। এক ঝলক চড়া রোদের তেজ অন্ধকার বাড়িটায় ছড়িয়ে পড়ল। দালানের মেঝেয় বড়ো বড়ো জলভরা জালা বসানো। মার্গারেট ও তাঁর বান্ধবীরা একটু ঘাবড়ে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে ছাতা, স্কার্ফ, হ্যান্ডব্যাগ এসব বাজে জিনিসের বোঝা রাখেন কোথায়? আসবাবপত্রের চিহ্ন নেই কোথাও। স্বামী যোগানন্দ শুধু বললেন, জুতো ছেড়ে রেখে যেতে, তারপর স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে কোথায় সরে পড়লেন। এঁরা চললেন দোতলায়।

উপরে একখানা মোটে ঘর, দরজা খোলা। জনাদশেক মহিলা মাটিতে বসে আছেন। ঘরের মাঝখানে সারদা দেবী। তাঁর মুখখানি এখন ঘোমটা ঢাকা নয়। এঁরা ঢুকতেই শান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। ব্যাস! চিরদিনের জন্যে কেনা হয়ে গেলেন স্নেহবুভুক্ষু এই তিনটি মেয়ে। তিনি যে সত্যিকারের মা। কথার কথা নয়, পাতানো মা নয়। একদম আপন মা। ঘরে আর যে মেয়েরা বসে আছেন তাদের দিকে মুখ করে একটা চাটাইয়ের ওপর বসে আছেন মা। পরনে সাদা শাড়ি। তারই আঁচল দিয়ে মাথায় ঘোমটা দেওয়া। অনাবৃত কাঁধে ছড়ানো দীর্ঘ কালো কেশ, আর আলতার মতো পা দু'খানি টুকটুক করছে। বিদেশিনীরা নত হয়ে প্রণাম জানাতেই তিনি দুটি হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রতি নমস্কার করলেন। তিনটি মেয়েরই বুক দুরুদুরু। এই সময় ঘরের মেঝেয় খসখস শব্দ তুলে সাবধানে পাশ কাটিয়ে আরেকটি মেয়ে এগিয়ে এল। তিনখানি কাজ করা ছোটো ছোটো মাদুর সযত্নে পেতে ইশারায় বসতে বলে মেয়েটি সরে গেল। ঘরের নিস্তব্ধতা যেন ভারী হয়ে উঠছে, কেমন একটা অস্বস্তি সকলের মধ্যে। সবাই তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে নিবেদিতার আর চোখ তুলে তাকাতে সাহস হয় না। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, বুক দুরুদুরু করছে। কে যেন হাই তুলছে ঘরের ভিতর। নোনাধরা দেওয়ালে একটা টিকটিকি গুটিগুটি এগোচ্ছে। মহাকাল এসে থমকে দাঁড়িয়েছে এই ঘরটিতে। সে জানে এই মুহূর্তটি ঐতিহাসিক, না এলে পরবর্তী শতকের ইতিহাস রচনা হতো কেমন করে!

হঠাৎ নিবেদিতা শোনেন, মেয়েরা কী যেন ফিসফিস করছে। সবারই চোখে একটা কৌতূহল। ব্যাপার কী? এবার এক মহিলা এদের তিনজনের সামনে রেকাবিতে কাটা ফল, মিষ্টি ও সেইসঙ্গে চা ধরে দিচ্ছেন। সারদা দেবীর জন্যে চীনমাটির পাত্রে ওই জলযোগের একই উপকরণ আনা হয়েছিল। সবাইকে অবাক করে পরম নিষ্ঠাবতী শ্রীশ্রীমা তাঁর সাগরপারের তিনটি মেয়ের সঙ্গে একত্রে বসে খেতে লাগলেন। মায়ের মুখেও কিসের আলো? মৌন ভেঙে নিবেদিতা হঠাৎ উঁচু গলায় বলে উঠলেন কী যে অপরূপ। সারদা দেবী হাসলেন। ইংরেজি জানা একটি মেয়ের মাধ্যমে দিব্যি আলাপ জমে গেল। তাঁর এই খ্রিস্টান মেয়েদের সব খবর শ্রীমা

জানতে চান। তোমারা বাড়িতে কীভাবে ঠাকুর পূজা কর? কী ধরনের প্রার্থনা কর তাঁর কাছে? তোমাদের বাপ-মা এখনও বেঁচে আছেন? অবরোধবাসিনী হলেও বাইরের জগতের খবর রাখতেন সারদা দেবী। কত বিচিত্র রূপেই না এ বিশ্বে দেবতার প্রকাশ। কথাবার্তায় এমন একটা অন্তরঙ্গতা নিবিড় হয়ে উঠল যে নিবেদিতা ভাবতে লাগালেন, এমন বিমল আনন্দের ভাগ নিতে স্বামীজী আসছেন না কেন? নিবেদিতা মুখফুটে বলেই ফেললেন সে কথা। আচ্ছা, স্বামীজী আসছেন না কেন? তিনি নিশ্চয়ই কাছাকাছিই আছেন, যাই আমি গিয়ে ডেকে আনি, বলে যেমন উঠি উঠি করছেন, এমন সময় মা সশব্দে হেসে উঠলেন, এমন করে হাসলেন যেন কতদিনের চেনা। তাঁর আদরের খুকির পাগলামি যেন তাঁকে আরও স্নেহাতুর করে তুলেছে। নিজের থালা থেকে একটুকরো ফল নিয়ে ওদের খাইয়ে দিলেন মা। মা-কে সেদিন অমৃতময়ী জননীরূপে দেখলেন এই তিন তরুণী। বাগবাজারের কানাগলিতে বিরাজ করছেন শান্ত কোমল ভালোবাসা দিয়ে গড়া পৃথিবীর মা, শ্রীরামকৃষ্ণের সারদা।

এমন সময় দালান পেরিয়ে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে সবার শাড়ির আঁচল উঠে এসেছে মাথায়। মুখ ঢাকা পড়েছে। হাতের পাখা থেমে গেছে। প্রতিটি মেয়েকে মনে হচ্ছে একটি অনবয়ব নিঃসাড়, অবোধ্য একটি শুভ্র বস্ত্রপিণ্ড। বিবেকানন্দ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন শ্রীমাকে। মা আশীর্বাদ না করা অবধি পড়ে রইলেন। তারপর একটি কথাও না বলে উঠে দাঁড়ালেন। তিনজনকে মায়ের কাছে বিদায় নিতে নির্দেশ দিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বেরিয়ে যেতে মা ঘোমটা খুলে মেয়েদের আশীর্বাদ করলেন। নিবেদিতাকে বললেন, 'তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি মা'।

বাগবাজারে স্নানের ঘাটে মেয়েরা সকালে বিকেলে নাইতে যেত, পরস্পর নানারকম সুখ-দুঃখের কথা হতো, লাল রঙের সূর্য গঙ্গার গেরুয়া জলে ধীরে ধীরে মিশে যেত রোজ ওদের কথা শুনতে শুনতে। সেদিন মেয়েরা সবাই বলাবলি করছিল জানো শ্রীমা আমাদের মতোই সেই খ্রিস্টানি মেয়েটিকেও মা বলে ডেকেছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রায় পাঁচশো বছর পর আবার এমন কথা শুনছি আমরা, শুনছেন সূর্যদেব। হিন্দুঘরের বিধবা ব্রাহ্মণী যাঁকে সবসময় ঘিরে থাকত বামুন কায়েত ঘরের বউ-ঝিয়েরা, এমন নিষ্ঠাপরায়ণ মা অজ্ঞাতকুলশীল যবনীকে এককথায় দান করলেন এক অপরিসীম মর্যাদা, সমাজের তোয়াক্কা করলেনই না। অথচ এই বিপ্লবটুকু হলো নীরবে, নিঃশব্দে, শুধু ভালোবাসার জোরে। তিনি এমনভাবে নিবেদিতাকে সমাজে না বসালে, ঠাকুরের কাজ হতো কেমন করে! পরবর্তীকালে নিবেদিতা লিখেছেন এই দিনটির কথা 'ডেজ অব দ্য ডেজ'। তাঁর জীবনের সেরা দিন।

নিবেদিতা সত্যিই খুকি হয়ে উঠলেন সারদা মায়ের। মায়ের অপাপবিদ্ধ ভালোবাসায় নিবেদিতা ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর লন্ডনের বিলাসবৈভব জীবনের কথা। মায়ের বাড়িতে বোসপাড়া লেনে এসে কিছুদিন থেকেছিলেন খুকি। একদিন দৌড়তে দৌড়তে নিয়ে এলেন বান্ধবী নেল হ্যামন্ডের চিঠি । অনুবাদ করে শোনালেন, নেলের জন্যে মায়ের আশীর্বাদ চেয়ে নিলেন। আবার কোনোদিন বায়না ধরলেন মায়ের ছবি তোলানোর। ভাগ্যিস এই বায়না করেছিলেন, না হলে সারা বিশ্ব তাদের মায়ের মুখ দেখত কেমন করে? পাঁচ বছরে বিয়ের পর থেকে কোনোদিন মায়ের মুখ কেউ দেখেনি। স্বামীজীও না, ঠাকুর রামকৃষ্ণও না! কী অসামান্য আত্মবিলুপ্তি। মাথার ঘোমটাটি না খসিয়ে, পলকের জন্যে তাঁকে মুখখানি না দেখিয়ে নিরন্তর স্বামীর সেবা করে গেলেন। কেন এড় আড়াল? স্বামীর সাধনায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে তাই? ছবি তুলতে গিয়ে সেই প্রথম অপরিচিত কোনো পুরুষের দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, অথচ আত্মসচেতনতার লেশমাত্র ছিল না চোখেমুখে।

আমি মহাকাল। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে পাই তিনকন্যার একজন সারাবুলেরই উৎসাহ ছিল ছবি তোলার ব্যাপারে। বায়না করেছিলেন মায়ের একটি ছবি আমেরিকায় নিয়ে যাবার। মায়ের প্রবল আপত্তি ছিল ছবি তোলার ব্যাপারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিবেদিতাই মা-কে রাজি করান। আদরের খুকির আবদার মা ফেলতে পারেননি। একজন সাহেব ফোটোগ্রাফার আসেন মায়ের ছবি তুলতে। প্রথম ছবিটা তোলার সময় সারদাদেবী দৃষ্টি নত করেছিলেন। দ্বিতীয় ছবিটি তোলার সময় সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসেছিলেন। আর তৃতীয় ছবিতে মা এবং নিবেদিতা মুখোমুখি বসেছিলেন। এইগুলিই মায়ের প্রথম ফোটোগ্রাফ।

কাশ্মীর থেকে ফেরার পর নিবেদিতা বায়না ধরেছিলেন মায়ের বাড়িতেই থাকার জন্যে। কিন্তু মায়ের বাড়িতে যেসব হিন্দু মেয়েরা থাকতেন এ তাদের একেবারেই পছন্দের ছিল না। গোপালের মা-ও এই নিয়ে খুব আপত্তি করেছিলেন। যাইহোক, মায়ের ইচ্ছাতেই একটি ঘর খালি করা হয় নিবেদিতার জন্য। সেখানে আট দশ দিন ছিলেন নিবেদিতা। সিস্টার একজায়গায় লিখেছেন, 'আমি যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলাম তা ভারী অদ্ভুত ধরনের। একতলায় ঢোকার মুখে দুদিকে দুটি ঘর ছিল। একটি ঘরে সাধু যোগানন্দ বাস করতেন, ক্ষয়রোগে তিনি অসুস্থ ছিলেন তখনই। নিবেদিতাকে বাংলা শেখাতেন। পিছনের রান্নাঘরে তার এক শিষ্য এবং এক ব্রাহ্মণ কাজকর্ম করতেন। ছাদ বারান্দা সমেত সমস্ত উপরতলা আমাদের। অদূরেই গঙ্গা, উপরতলা থেকে গঙ্গা দর্শন হতো।

শ্রীশ্রীমা পড়তে জানেন এবং অনেকটা সময় রামায়ণ পাঠ করে কাটান। তিনি লিখতে পারেন না কিন্তু তাতে তাঁকে শিক্ষিতা নয় এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষের অধিকাংশ তীর্থস্থান তিনি ঘুরেছেন। দীর্ঘদিন

সংসার ও ধর্মজগত সম্পর্কে কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। মা বড়ো মধুর। কঠিন বিষয় নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সহজ সরল করে নেন। নিজের ঘরে যখন পুজোয় বসেন, মেয়েরা দীপ জ্বালা, গঙ্গাজল আনা, ধূপধুনো জ্বালা, ফুলের নৈবেদ্য সাজানোতে ব্যস্ত থাকতেন। দুপুরে খাওয়ার পর বিকেলে বিশ্রাম, তারপর সন্ধ্যে হলে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালা হতো। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ছাদে তুলসীতলায় যেত সকলে। গুরুপ্রণামের পর মায়ের আর গোলাপ মায়ের পায়ে সবাই প্রণাম করত।'

এমন সাদামাটা হিন্দুপরিবারে স্থান পেতে চেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। মাত্র সাত আটদিনই মায়ের সঙ্গে ছিলেন তিনি। মা অটুট বাঁধনে বেঁধে নিয়েছিলেন নিবেদিতাকে। পাড়ার লোকেরা অনেক কিছু বলাবলি করছিল, বাড়িতে ফিরিঙ্গি মেয়েকে ঠাঁই দেবার জন্য, কিন্তু মা তো সত্যিকারের মা, নিজের মেয়েকে লোকের কথায় ছেড়ে দেবেন কেমন করে? মা বলতেন, 'আহা কী সরল বিশ্বাস, যেন সাক্ষাৎ দেবী, নরেনকে কী ভক্তিই করে। সে ওই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে কাজ করছে। কী গুরুভক্তি। এদেশের উপরই বা কী ভালোবাসা!' নিবেদিতা তার গর্ভধারিণীকে বলতেন লিটল মাদার আর সারদা মা হয়ে উঠলেন তাঁর নিজেরই মা! এর মধ্যে সত্যিকারেরই বিব্রত হতে হচ্ছিল এই বাড়ির মানুষগুলোকে নিবেদিতাকে আশ্রয় দেবার জন্য। তাই মায়ের ইচ্ছে না থাকলেও পাশেই আরেকটি বাড়িতে ১৬ নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা উঠে গেলেন। কিন্তু ওই ঘুপচি বাড়িটা তে ছোট্ট ছিল, গরমকালে নিবেদিতার বড়ো কষ্ট হতো। তাই প্রায় প্রতিদিন বিকেলে মায়ের নির্দেশে নিবেদিতা আসতেন মায়ের বাড়ি বিশ্রাম নিতে। কারুর কোনো নির্দিষ্ট ঘর ছিল না। লাল মেঝেতে সারি সারি মাদুর বিছানো থাকত। মায়ের অন্য মেয়েদের সঙ্গে সাগরপারের এই খুকিও মায়ের আঁচলধরা আদুরে মেয়ে হয়ে উঠেছিলেন। তাই না ১৩ নভেম্বর আবার মহাকাল এসে দাঁড়াল ১৬ নং বোসপাড়া লেনে? মা সারদা নিবেদিতার বাড়িতে এসে পুজো করে স্কুলের সূচনা করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং মায়ের কিছু মহিলা ভক্তকে নিয়ে পুজো হলো। আজকের শিশুকন্যারা ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু বিদুষী নারী হয়ে উঠবে। স্বামীজীর স্বপ্ন সফল করতে মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া আর কী পাথেয় হতে পারত সেদিন?

১৮৯৯ সালে এমন এক দিনে স্বামী যোগানন্দ দেহ রাখলেন। সেই স্বামী যোগানন্দ যিনি নিবেদিতাকে প্রথম মায়ের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে। নিবেদিতা তার প্রিয় বান্ধবী জোসেফিনকে পরের দিন চিঠিতে লিখছেন সেকথা। মা নিজের ঘরে পা ছড়িয়ে বসে আকুল হয়ে কাঁদছেন, কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গেলে তিনি বলেন আমার ছেলে যোগেনের কী হবে বাবা? আমি যে দেখলুম ঠাকুর নিতে এসেছেন। বলেই বললেন কাউকে বোলো না— বলতে নেই। বিকেলবেলা যোগানন্দ বললেন আমাকে গীতা পড়ে শোনাও, গীতাপাঠ শেষ হলে তিনি বলেন সব কিছু বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আর কোনো কষ্ট নেই— এই বলে জয় রামকৃষ্ণ বলে ঢলে পড়লেন। মাথার কাছে বসেছিলেন কৃষ্ণলাল মহারাজ, তিনি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন, উপর থেকে মা-ও হাহাকার করে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। নিবেদিতা তখন মায়ের হাত ধরে বসে রয়েছেন পাশটিতে। এমনভাবে অনেক সময় কাটল, স্বামীজীও এসেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই তো অসুস্থ, তাই গিরীশবাবু তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মঠে ফেরত পাঠালেন। এমন সময় পঞ্চাশ যাট জনের সমবেত হরি ওঁ মন্ত্র শুনতে পেয়ে মা নিবেদিতাকে তাড়াতাড়ি নেমে যেতে বললেন। মাথায় গেরুয়া রঙের রেশমি পাগড়ি-সহ স্বামীজীর ছড়িয়ে দেওয়া ফুলে সর্বাঙ্গ ঢাকা মরদেহটি সদানন্দ এবং অন্য আরেকজন তুলে ধরতেই কর্পূর জ্বেলে আরতি করা হলো। নামগান করতে লাগল সকলে। এতকাল যিনি ছিলেন গৃহের কর্তা তিনি আজ চিরতরে ছেড়ে চললেন। মা আর যোগীন মা-র হৃদয় বুঝি ভেঙে গেল— মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমার যোগেন আমায় ফেলে চলে গেল, কে আমায় দেখবে? সব শেষ হয়ে গেল, বাড়ির একখানা ইঁট খসল এবার সব যাবে।' মা তারপর ছ-মাসের জন্য গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

জীবন বড়ো সংক্ষিপ্ত। ১৯১১ সালে মায়ের আদরের খুকি ছেড়ে গিয়েছেন পৃথিবী। সেদিনও হয়তো মা ডুকরে কেঁদেছেন এই অভাগী ভিনদেশি ফিরিঙ্গি কন্যাটির জন্য। কিন্তু তার আগে এই চিঠিটাই তাঁর মায়ের পায়ে শেষ অর্ঘ্য ছিল।

১৯১০ সালে ১১ ডিসেম্বর কেমব্রিজ থেকে মাকে লেখা চিঠি নিবেদিতার, সেদিনের তিনকন্যার এক কন্যা সেদিন মৃত্যুশয্যায়। প্রাণমন ঢেলে সেবা করছেন নিবেদিতা।

আদরিণী মা,

সবার জন্য প্রার্থনা করব বলে গির্জায় গিয়েছিলাম, সবাই যেখানে যীশুজননী মেরীর কথা ভাবছে আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা চাহনি, পরনে সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা, সবই যেন বাস্তব হয়ে ফুটে উঠল। আমার মনে হলো তোমার সেই ভালোবাসা মাখা মনটাই সারার রোগজর্জর দেহে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম জানো মা? ভাবছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় তোমার ঘরে বসে যে আমি ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা কী বোকামিই ছিল। মা মাগো, তখন কেন বুঝিনি যে তোমার পায়ের কাছে ছোট্ট শিশুর মতো বসে থাকাটাই যথেষ্ট। মাগো ভালোবাসায় ভরা তুমি, আমাদের জাগতিক ভালোবাসার মতো তাতে উত্তেজনা বা উগ্রতা নেই, তোমার ভালোবাসায় দুঃখ দূর করে। কয়েকমাস আগে মাগো সেই রবিবারের কথাটা মনে পড়ে, গঙ্গাস্নানে যাবার আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান করে এসেই তোমার ঘরে গেলাম, তুমি আমার মাথায় হাত রাখলে মা, মাগো আমার সব বেদনার মুক্তি হলো যেন। প্রেমময়ী মা, আমার তোমার জন্য যদি একটি কবিতা বা গান লিখে পাঠাতে পারতাম, তাতেও মনে হবে সেটা উগ্রতা। এই কোলাহল তোমার ভালোবাসার জন্যে নয়। তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্ব প্রেমসুধা ধারণের পাত্র। এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই রয়েছ তাঁর সন্তানদের কাছে ঠাকুরের প্রতীক হয়ে। তোমার কাছে আমাদের শান্ত স্তব্ধ হয়ে থাকা উচিত, অবশ্য কিছু কিছু মজা করার সময় ছাড়া। ভগবানের যা কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই তোমার মতো, বাতাস, আলো, ফুলের সুগন্ধ গঙ্গার স্নিগ্ধতা এইসব শান্ত নীরব জিনিসই তোমার তুলনা মা।

বেচারি সারার জন্য তোমার আঁচলখানি পাঠিয়ে দিও, রাগ-দ্বেষের ঊর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, তোমার নামটি সেখানেই সমাহিত। সেই প্রশান্তি পদ্মপাতায় জলের মতো, কখনই মলিন হয় না। বড়ো সোহাগের মা আমার।

তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকি—

তোমার নিবেদিতা।

(মা সারদার তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

করোনা মোকাবিলায় আয়ুশ মন্ত্রকের ভূমিকা

ডাঃ সমরজিৎ ঘটক

আয়ুশ মন্ত্রক হলো ভারত সরকারের হেলথ্ ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত একটি শাখা। ইংরেজিতে AYUSH বলা হয়। এর ফুলফর্ম হলো আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি। এর মধ্যে যোগ হলো নন ফারমাকোলজিক্যাল অর্থাৎ কোনো ওষুধের প্রয়োগ হয় না। বাকি চারটি হলো ফার্মাকোলজিক্যাল। এগুলি উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর নীট পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্ররা পড়ার সুযোগ পান। কোর্সগুলি সাড়ে পাঁচ বছরের। ফাইনাল ইয়ার পাশ করার পর বাধ্যতামূলক সরকারি হাসপাতালে ট্রেনি ডাক্তার হিসাবে কাজ করতে হয়। তাবেই রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায়। কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রতিটি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরেও নিজস্ব আয়ুশ বিভাগ আছে।

করোনা মহামারী ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আয়ুশ মন্ত্রক সক্রিয় ভাবে এর মোকাবিলায় নিজেদের কাজ শুরু করে দেয়। ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ আয়ুর্বেদ গবেষকদের নিয়ে একটি টিম তৈরি করে আয়ুশ ক্বাথ নামে একটি ভেষজ ফর্মুলা বানানো হয় এবং তা বানানোর জন্য আয়ুর্বেদ ফার্মা কোম্পানিদের নির্দেশ দেওয়া হয়। সব রাজ্যের আয়ুশ বিভাগকে এই সংক্রান্ত প্রতিলিপি পাঠানো হয়।

এই আয়ুশ ক্বাথের উপাদনগুলি এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যেন সব লোকের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও সহজলভ্য হয়। নোটিশ : ২৪.৪.২০২০ মাননীয় কেন্দ্রীয় আয়ুশ সচিব Dr. Rajesh Kotecha দেশের সমস্ত আয়ুর্বেদ চিকিৎসককে নিয়ে অনলাইন একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে,আয়ুশ ক্বাথ-এর সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। বহু নামকরা প্রাইভেট সংস্থা যেমন আর্য বৈদ্য ফার্মেসি (এভিপি) এই কাজে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করে।

এভিপি কর্ণধার পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপ্ত শী পি আর কৃষ্ণকুমার (P.R. Krishnakumar) ও Zaudu Tmami Group-এর ভাইস চেয়ারম্যান Dr. Pawan Sharma , সেরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হিসেবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত Dr. L. Mahadevar প্রমুখ ব্যক্তি কেন্দ্রীয় আয়ুশ মন্ত্রকের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী আয়ুশ ক্বাথের ফর্মুলা বানানোর পরে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জন্যও সরকারি নির্দেশিকা জারি হয়। স্ট্রেজ ওয়ান, টু, থ্রি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে রোগীদের চিকিৎসার রূপরেখা তৈরি হয়। বিভিন্ন রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের উপর আয়ুর্বেদ চিকিৎসা প্রয়োগ করে যথেষ্ট সাফল্য আসে। তবে এই চিকিৎসাগুলি সম্পূর্ণ গবেষণা ভিত্তিক এবং নির্দিষ্ট রোগীর জন্য প্রযোজ্য (Individual approach) । দুঃখের বিষয়, কিছু ব্যবসায়ী সংগঠন করোনার নামে নিজেদের কিছু ওষুধ Over the Cointer (OTC) মেডিসিন হিসেবে বাজারে বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাড়ার চেষ্টা করে যেখানে আয়ুশ ডাক্তারদের কোনও প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। আয়ুশ মন্ত্রক কঠোর হাতে এদের দমন করে এবং এই জাতীয় প্রোডাক্ট বাজারে আসতে দেয়নি। এটি একটি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ।

আমাদের রাজ্যও পিছিয়ে নেই। এখানে সরকারি আয়ুর্বেদ হাসপাতালে ও ডিসপেনসারিতে আয়ুশ চিকিৎসকেরা রোগপ্রতিরোধক এবং জ্বর মোকাবিলায় আয়ুর্বেদকে যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করছেন। রাজ্য পঞ্চায়েত আয়ুশ মেডিক্যাল অফিসারেরা গ্রামের লোকেদের সেবায় কাজ করছেন। কিছু ক্ষেত্রে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে কেউ কেউ বেফাঁস মন্তব্য করায় দেশ-বিরোধী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সুযোগ এসে যায় সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ সমাজকে বদনাম করার। তাই আমার ব্যক্তিগত অভিমত, আয়ুর্বেদ বিশারদ বা গবেষক ছাড়া কারোর উচিত নয় কোনো গাছপালা বা দ্রব্যের ভেষজ গুণাগুণ নিয়ে মন্তব্য করার।

শেষকালে বলবো, করোনা মোকাবিলায় নিজের সুরক্ষার জন্য সকলে আয়ুশ সঞ্জীবনী মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করুন। আর কোনো উপসর্গ এলে নিকটবর্তী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সবাই সুস্থ থাকুন।

(লেখক আয়ুর্বেদ স্বাস্থ্য আধিকারিক)

বিজেপি নেতারাই সবার টার্গেটে

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সমস্ত স্থানেই বিজেপি নেতারা বিরোধীদের টার্গেটে। ছোটো থেকে শুরু করে বড়ো মাপের — সর্বত্রই একই চিত্র। জাতীয়তাবাদী দলকে উৎখাত করাই এদের মূল লক্ষ্য। হিজবুল থেকে শুরু করে লস্কর-ই-তৈবা সবাই একযোগে শুরু করেছে বিজেপিকে নিকেশ করার কাজ। এদের আবার হেডমাস্টার পাকিস্তান। যে নাকি চীনের বিরাট বন্ধু। সেই স্বাধীনতার পর থেকে শুরু হয়েছে এদের ভারতের সঙ্গে শত্রুতা। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দল। কারণ ঘরে যদি সাপ ঢোকে নিদ্রার আর শান্তি কোথায়! এখন বর্তমানে বিজেপি হয়েছে সবার টার্গেট। জাতীয়তাবাদী দলকে নিকেশ করতে পারলেই দেশকে টুকরো টুকরো করার আর বাধা কোথায়। গত বছর ৩৭০ ধারা বিলোপ, রাম মন্দিরের পক্ষে রায়, তিনতালাক রদ, নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন সবই পাকিস্তানপন্থীদের গায়ের জ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুরু হয়েছে কাশ্মীরকে দখল করার নতুন ছক। কয়েকদিন আগে তিনজন বিজেপি নেতাকে হয়েছে। শুরু হয়েছে কাশ্মীর দখল করার নতুন ছক। ঘটনাটি ঘটেছে কাশ্মীরের বান্দিপরা জেলায়। স্থানীয় বিজেপি নেতা ওয়াসিম বারি এবং তার বাবা ও ভাই বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় জঙ্গিদের গাত্রদাহের কারণ। এদের টার্গেটের মূল কারণ কাশ্মীর উপত্যকায় কেউ যেন বিজেপি না করে। বারামুলা জেলায় এক জনবহুল এলাকা থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে মেহরাজ উদ্দিন মাল্লাকে জঙ্গিরা অপহরণ করে। তার খোঁজে চলছে চিরুনি তল্লাশি। তিনি ছিলেন ওয়াটারগাঁও পৌরসভা কমিটির সহ-সভাপতি। এভাবে চলতে থাকলে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বিজেপি করার ইচ্ছা অনেকেই হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু বর্তমান মোদী সরকার কঠোর হস্তে এমন সংকটময় পরিস্থিতিকে সহজেই সমাধান করবে বলেই সবার ধারণা। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিজেপি নেতাদের খুন অপহরণ এবং বিভিন্নভাবে হেনস্তার হাত থেকে বাঁচতে সরকার সদর্থক ভূমিকা নেবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া গণতন্ত্র হচ্ছে আইয়ুব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্রের' মতো?

বাংলাদেশে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা হলো 'সোনার হরিণ'। সোনার হরিণের পেছনে না ছোটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সোনার হরিণ অবাস্তব, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বাংলাদেশে সেক্যুলারিজমও তাই। ওটা কেতাবে আছে, বাস্তবে নেই।

সেকুলারিজমের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হচ্ছে, বছর দুই আগে দিল্লির এক নারীবাদী লেখিকা টুইট করেন যে, 'ভারতে সেক্যুলারিজম হচ্ছে ইসলামি মৌলবাদ, মাইনাস 'টুপি'। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের মোল্লারা বলতে পারেন, 'বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে হিন্দুত্ব, মাইনাস 'পূজা'। অনেকে বিষয়টা সেভাবেই দেখেন। কেউ কেউ বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা। বোদ্ধারা বলেন, সেকুলারিজম হচ্ছে, রাষ্ট্র থেকে ধর্মের পৃথিকীকরণ।

বাংলাদেশেও সেকুলারিজম শব্দটি ডিকশনারিতে আছে। নেতারা মাঝে মাঝে এ নিয়ে গলাবাজি করেন, বাস্তবে এর লেশমাত্র চিহ্ন কোথাও নেই। তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির তেমন প্রচলন ছিল না। বঙ্গবন্ধু সংবিধানে এটি সংযোজন করে নিজের জনপ্রিয়তায় ধস নামাতে সাহায্য করেন। পার্লামেন্টে জাতির জনক এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু কে শুনে কার কথা!

'সেকুলারিজম' কী বস্তু ,সরকার জনগণকে তা বোঝানোর প্রয়াস নেয়নি। ফলে জনগণ বুঝেছে বা স্বাধীনতা বিরোধীরা জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে ধর্মহীনতা, অর্থাৎ 'ইসলাম গেল'। দেশটি সদ্য স্বাধীন। জাতি একটি লাল-সবুজ পতাকা পেয়েছে, কিন্তু মানুষগুলোর তো পাকিস্তানিই রয়ে গেছে। সেকুলারিজম তাই সেদিনও গ্রহণযোগ্য ছিল না, আজও গ্রহণযোগ্য নয়।

একদা তুরস্কে সেকুলারিজম ছিল। বাংলাদেশ ও তুরস্ক এখন দ্রুতলয়ে ইসলামি বলয়ে ঢুকছে। মুসলমান দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতা নেই। কারণ ইসলাম ও গণতন্ত্র সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশেও তাই থাকার কোনো কারণ নেই। এসব ভালো জিনিস পশ্চিমা উন্নত বিশ্ব বা নিদেনপক্ষে ভারতে মানায়, আমাদের দরকার নেই! আমাদের উন্নত চিকিৎসা বা শিক্ষাব্যবস্থার দরকার নেই। ওগুলোর জন্যে 'বিদেশ' আছে, অথবা ঘরের পাশে ভারত। উন্নত চিকিৎসার জন্যে আমরা সিঙ্গাপুর যাবো, নইলে চেন্নাই। শিক্ষার জন্যে ভারত বা সুযোগ পেলে আমেরিকা। আমরা দেখেও দেখি না যে, বিশ্বের উন্নত দেশগুলো সবই ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্ম নির্বিশেষে ওরা সবাইকে মানুষ হিসেবে দেখে। 'সেকুলারিজম' আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি অন্যতম উপাদান। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে। এই 'বদলে যাওয়া' হওয়া উচিত 'ইতিবাচক'। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা না হলে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানুষ একদিন অধৈর্য হয়ে পড়বে। সেটা বুঝেই বঙ্গবন্ধু বাহাত্তরের সংবিধান দিয়েছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ ধনী, কিন্তু সুযোগ পেলে ওরা সবাই আমেরিকা বা ইউরোপ পাড়ি জমাবে। বাংলাদেশের মানুষকে আমেরিকা বা সৌদি আরবের মধ্যে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিলে সবাই আমেরিকা যাবে। সৌদি আরব যাবে হজ করতে, থাকবে আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া। কেন? এই 'কেন'র উত্তর হলো 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা'। এর ওপর কোনো ব্যবস্থা নেই। গণতন্ত্র চাই, আর ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া গণতন্ত্র আইয়ুব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্রের' মতো হয়ে যায়। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্যেই ধর্মনিরপেক্ষতা দরকার। নূর হোসেন যে গণতন্ত্রের জন্যে প্রাণ দিয়ে গেছেন,

বাংলাদেশে সেই গণতন্ত্র এখনো 'অধরা' রয়ে গেছে। গণতন্ত্র ছাড়া মুক্তি নেই। মুক্তির জন্যে গণতন্ত্র চাই। বলা হয়, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর বাহাত্তরের সংবিধানের কফিনে শেষ পেরেকটি মারা হয়ে গেছে। সংবিধান তো মানুষের জন্যে, জনগণ চাইলে শেষ পেরেকটি খোলা কি খুব কঠিন? না খুললে কী হবে? দি বাংলাদেশ ক্রনিক্যাল ২ জুলাই ২০১৮-তে এক নিবন্ধে প্রশ্ন রেখেছে, বাংলাদেশ কী পাকিস্তান হবে না কাশ্মীর হবে?

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউইয়র্ক।

বিস্মৃতির আড়ালে বিপ্লবী দাশরথি তা

সেটা ১৯৪২ সাল। সারাদেশে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে চলছে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আর এই সময় বর্ধমান জেলার জামালপুর থানা দখল করে ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হলো ভারতের পতাকা। গায়ে খদ্দরের পোশাক চাপাতে বাধ্য হলেন থানার দারোগাবাবু। তারকেশ্বর-জামালপুর লাইন থেকে লোপাট হলো রেল। জামালপুর, রায়না ও খণ্ডঘোষ নিয়ে 'মহা ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকার' গড়লেন বিপ্লবীরা। যার নেতৃত্বে জেলায় এমন বিপ্লব গড়ে উঠেছিল, তিনি বিপ্লবী দাশরথি তা। ব্রিটিশ সরকার সেই সময়ে তাঁর মাথার 'দাম' ঘোষণা করেছিল ১০ হাজার টাকা। সে সময় তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। সূত্রে জানা যায়, গ্রামে ধরপাকড়ের জন্য পুলিশ যাতায়াত করলে, তিনি খড়ের গাদায় দিনেরর পর দিন লুকিয়ে ছিলেন। রাতের অন্ধকারে তাঁর অনুগামীরা তাঁর জন্য খাবার এবং জল পৌঁছে দিয়ে আসতেন। একবার গ্রামে পুলিশ হানা দিয়েছে খবর পেয়ে তিনি তালগাছে উঠে বসেছিলেন। পুলিশ সেই গাছের নীচ দিয়ে বার বার ঘুরে চলে গেলেও তার টিকিটি ছুঁতে পারেনি। স্বামীর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী রমারানিদেবীও। "গোরুর গাড়িতে চড়ে বোমা তৈরির সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হতো। পুলিশ গাড়ি আটকালে কাঁদতে শুরু করতেন তাঁর স্ত্রী। সঙ্গে গাড়োয়ান সেজে থাকা বিপ্লবী দাশরথি কাঁচুমাচু মুখে বাবা অথবা মা মারা যাওয়ার গল্প ফাঁদতেন। একবার তো প্রসব যন্ত্রণায় কাতর দেখিয়ে তাকে ঢেকেঢুকে বোমা, বন্দুক, গুলিও পাচার করা হয়েছিল।" ২৩ কার্তিক, ১৩১৮ বা ৯ নভেম্বর, ১৯১১ সালে বর্ধমান জেলার রায়না থানার ধামাস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন দাশরথীবাবু। মাত্র ১৯ বছর বয়সে ছাত্রাবস্থাতেই কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। সে সময় তিনি নানা নামে, নানা ঠিকানা থেকে স্বদেশী পত্রিকা বের করতেন। আর তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করত ব্রিটিশ সরকার। শেষে একদিন সংবাদপত্রেই বিজ্ঞাপন দিয়ে জানালেন 'মসি ছাড়িয়া অসি ধরিলাম।' দিনের পর দিন আহিরীটোলার বাড়িতে তল্লাশিতে আসা পুলিশকে ভুলিয়েভালিয়ে আটকে রাখার কাজও করেছেন রমারানিদেবী। একবার কলকাতার ২৭, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রোডের বাড়ি থেকে ২৮ নম্বর বাড়িতে ঝাঁপ দিয়ে পুলিশের নাগাল থেকে পালিয়ে যান। স্বাধীনতার পরেও সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন দাশরথীবাবু। ১৯৫২, ৫৭ ও ৬৭ সালে ভোটে জিতে বিধানসভার সদস্যপদ লাভ করেন। প্রথমে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী থাকলেও স্বাধীনতার পরে নিজেই গঠন করেন 'কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি'। ৬৭ সালে প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের 'প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স ফ্রন্ট' মন্ত্রীসভায় মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি বর্ধমানের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'দামোদর' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা থেকে পাওয়া যেত দাশরথীবাবুর সরস অথচ সমালোচনামূলক লেখা। ১৪ বৈশাখ, ১৩৮৭ বা ইংরেজি ২৭ বৈশাখ, ১৯৮০ এই মহান বিপ্লবীর জীবনাবসান হলেও তিনি এই অঞ্চলের মানুষের জন্য রেখে যান এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

—**ডাঃ বলরাম পাল,**
৩০/১৯, বারুইপাড়া ১ম বাই লেন, হাওড়া।

বাংলাদেশিদের আন্তরিক ব্যবহারে আপ্লুত পশ্চিমবঙ্গের পর্যটক!

গত ১৪ জুন একটি পত্রিকার রবিবাসরীয়তে এক ভদ্রলোকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'ঘুরে এলাম কুষ্টিয়া ও পাবনা' পড়ে মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছিল এবং সে সম্পর্কে পত্রিকার সম্পাদককে প্রশ্ন করে কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়েছিলাম। বলা বাহুল্য পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। ভ্রমণ বৃত্তান্তে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই মানুষের আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি চুয়াডাঙ্গায় যে মাটির বাড়িতে কাজি নজরুল ইসলাম বেশ কিছুদিন ছিলেন তার উল্লেখ করেছেন। তিনি ঠাকুর পরিবারের শিলাইদহের কুঠিবাড়ির কবিগুরুর বজরার বিবরণ দিয়েছেন। মীর মোসারফ হোসেনের সংগ্রহশালা এবং অডিটোরিয়ামও উল্লেখিত হয়েছে। কুষ্টিয়ার লালন শাহর মাজার ও সমাধি সৌধের উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখিত হয়েছে পাবনা শহরের বিখ্যাত রিকশা। সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা অনুকূল চন্দ্র ঠাকুরের আশ্রম সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য রয়েছে। সব থেকে বড়ো কথা, যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই মানুষের আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। সব থেকে বড়ো প্রশ্ন, বাংলাদেশের মানুষ যখন এতই উদার এবং ভদ্র তাহলে সে দেশের হিন্দুরা নিয়মিতভাবে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হচ্ছে কেন? হিন্দুকন্যারা অপহৃতা, ধর্ষিতা ও ধর্মান্তরিতা হতে বাধ্য হচ্ছে কেন? পাবনার ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আশ্রমের সেবাইত নিত্যরঞ্জন পাণ্ডেকে খুন করা হলো কেন? ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ধ্রুবেশানন্দকে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে বেলুড় মঠে আশ্রয় নিতে হলো কেন? ঢাকার গুলশানে হোলি বেকারি রেস্টুরেন্টে আয়ুষী জৈন নামে ১৯ বছরের এক তরুণীকে এবং আরও ১৯ জনকে কোরানের আয়াত বলতে না পারার অপরাধে গলার শ্বাসনালী কেটে হত্যা করা হয়েছিল কেন? হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করা এবং প্রতিমা ভাঙচুর করা হচ্ছে কেন? সব থেকে বড়ো কথা, অপরাধীদের কোনও শাস্তি হচ্ছে না কেন? বলাবাহুল্য সম্পাদক মহাশয় বা ভ্রমণ বৃত্তান্তটির লেখক কেউই প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

আমাদের প্রেরণাস্রোত জগদেওরামজী

অতুল জোগ

১৯৪৯ সালের ৭ অক্টোবর তৎকালীন সেন্টাল প্রভিন্স ও বেরার (মধ্যপ্রদেশ) এবং বর্তমান ছত্তিশ গড়ের যশপুরের কাছে কোমড়ো গ্রামের অঘনুরামের পরিবারে এক বালকের জন্ম হয়। নাম জগদেওরাম। জগদেওরামের পড়াশোনা জশপুর নগরে হয়। হাইস্কুলে পড়ার সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। ওই সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক শারদ কালের সম্পর্কে আসেন এবং কল্যাণ আশ্রমের কাজের সঙ্গে যুবক জগদেওরাম যুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে নাগপুরে ৪০ দিনের তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ সম্পন্ন করে কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শারীরিক শিক্ষা (ফিজিক্যাল এডুকেশন) গ্রহণের জন্য তঁকে শিবপুরীতে পাঠানো হয়। শিক্ষা শেষে জগবেদরামজী কল্যাণ আশ্রমের বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষক রূপে কাজ শুরু করেন। শারীর শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃত বিষয়েও ভালো পড়াতেন। জগদেওরামজীর মিশুকে স্বভাবের কারণে ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক হয়ে ওঠেন। শিক্ষকতার কাজ করতে করতেই ইতিহাসে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে রায়গড় জেলে ছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আবার কল্যাণ আশ্রমের কাজে লেগে পড়েন। ১৯৭৮ সালে কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় রূপ পাওয়ার পর বালসাহেব দেশপাণ্ডের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবাস আরম্ভ হয়। সেই সময় দেশপাণ্ডেজীর সহযোগী কার্যকর্তা রূপে জগদেওরামজীকে তাঁর সঙ্গে প্রবাস করতে হয়। এভাবে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে তাঁকে ভ্রমণ করতে হয়। এরপর বালাসাহেব দেশপাণ্ডেজী জগদেওরামকে মাঝে মাঝে একাই বিভিন্ন কার্যক্রমে পাঠাতে শুরু করেন। দেশপাণ্ডেজীর মনে হয়েছিল যে তাঁর উত্তরাধীকারী জগদেওরামজী হবেন, কারণ যে সমাজের জন্য এই কাজ চলছে, সেই সমাজকে ভালোভাবে বোঝেন এমন ব্যক্তিরই সংগঠনের নেতৃত্ব করা উচিত।

১৯৯৩ সালে ওড়িশার কটকে অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা সম্মেলনে শ্রদ্ধেয় দেশপাণ্ডেজী বলেন, 'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, সংগঠনের দায়িত্ব যুবকদের কাঁধে দেওয়াই ঠিক হবে।' বৈঠকে আলাপ-আলোচনার পর জগদেওরামজীকে কার্যকরী সভাপতি ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে প্রসন্ন সপ্রেজীকে মহামন্ত্রী এবং কৃপাপ্রসাদ সিংহজীকে যুগ্ম মহামন্ত্রী করা হয়।

জগদেওরামজী প্রবাসের সময় অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। একবার ঝাড়সুগুড়া থেকে মুম্বাই যাওয়ার সময় তাঁর জ্বর আসে। বসার সিট ছিল না। সেজন্য ট্রেনের কামরার শৌচালয়ের কাছে বসেই যাত্রা শেষ করেন। এভাবে কষ্ট করেই কাজ করেছেন।

১৯৯৫ সালে দেশপাণ্ডেজীর মৃত্যুর পর জগদেওরামজীকে সর্বভারতীয় সভাপতি ঘোষণা করা হয়। সেই সময় কিছু লোকের মনে হয় এই বনবাসী ব্যক্তি কীভাবে সংগঠন সামলাবেন? তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ শোনার পর সবার মনে বিশ্বাস জন্মে যে দেশপাণ্ডেজীর সিদ্ধান্ত একেবারে ঠিক। সারা দেশে তাঁর প্রবাস আরম্ভ হয়ে গেল। সব জায়গায় স্বাগত কার্যক্রমে পাওয়া শাল ও অন্যান্য বস্তু কর্যকর্তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে কল্যাণ আশ্রমের কাজের জন্য নিরন্তর প্রবাস করেছেন। বিভিন্ন কার্যক্রমে তাঁর উপস্থিতি প্রেরণাদায়ী হয়। নিজে জনজাতি সমাজের ছিলেন কিন্তু নিজের ওরাওঁ সমাজের প্রতি যত প্রেম ছিল অন্য জনজাতি সমাজের প্রতি ততটাই প্রেমভাব তাঁর মনের মধ্যে ছিল। শুধু নিজের সমাজ নয়, সব জনজাতি সমাজের সম্বন্ধে চিন্তা করাই তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিল।

'আমি জনজাতি সমাজের' এই ভাবনার থেকেও উপরে উঠে হিন্দু ভাবনার সঙ্গে তিনি একাত্ম ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। জগদেওরামজী জ্ঞানের ভাণ্ডার অসীম ছিলেন। তাঁর চিন্তাও মৌলিক ছিল। এই কারণে ২০১২ সালে International Centre for Cultural Studies (I.C.C.S) দ্বারা International Conference of the Elders of Ancient Traditions সম্মেলনের আয়োজন হরিদ্বারের দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়। এই সম্মেলনে জগদেওরামজীকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে University of World Ancient Traditions & Cultural Heritage, USA ডক্টরেট উপাধিতে সম্মানিত করে। ২০১১ সালে ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার দ্বারা 'আদিবাসী সেবা সম্মান' প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মৌ থেকে 'স্বর্গীয় ভাউরাও দেওরস সেবা সম্মান'-এ ভূষিত হন। এভাবে তাঁর সেবা কাজের মান্যতা ও প্রসংসা শুরু হয়ে যায়। এতসব সম্মান পাওয়ার পরেও কোনোরূপ অহংকার তাঁকে স্পর্শ করেনি। এইরকম আত্মবিলোপী, সহজ ও সরল স্বভাবের বড়ো মনের মানুষ

ছিলেন তিনি।

জগদেওরামজী সব কার্যকর্তাদের মঙ্গল চিন্তা করতেন এবং সবাইকে স্নেহ করতেন। নিজের মিশাবন্দি পেনশনের অর্থ এবং অন্য যেকোনো অর্থ পেলে কার্যকর্তাদের জন্য বইপত্র কিনতেন বা মন্দিরের পূজারিকে দিয়ে দিতেন বা পূজাপাঠে খরচ করতেন। এ রকম নির্মোহী ব্যক্তি ছিলেন জগদেওরামজী। বিভিন্ন গ্রন্থের গভীর অধ্যয়নের এবং স্মরণশক্তির কারণে তাঁর ভাষণ কার্যকর্তাদের কাছে প্রেরণাদায়ী ছিল। তিনি উচ্চকোটির বক্তা ছিলেন।

তাঁর সঙ্ঘভাব এবং স্বয়ংসেবকত্ব কখনোও বিস্মরণ হয়নি। যেদিন তিনি পরলোকগমন করেন সেদিন রায়পুরে কল্যাণ আশ্রমের কেন্দ্রীয় কার্যকরী মণ্ডলের বৈঠক ছিল। কিন্তু জগদেওরামজী যশপুরেই ছিলেন। মহামারী করোনার কারণে প্রবাস বন্ধ ছিল। শরীরও ভালো না থাকার কারণে ডাক্তার ঘোরাফেরা কম করার অনুরোধ জানান। তবু বৈঠকে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা ছিল। বৈঠকে সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয়জী উপস্থিত থাকবেন, সেজন্য জগদেওরামজী রামলাল সোনীজীকে আগ্রহ করেন যে আমাকে কোনো গাড়িতে বৈঠকে নিয়ে চলো। সহ-সরকার্যবাহ বৈঠকে আসবেন আর আমি বৈঠকে যাব না এটা ঠিক নয়। সোনীজী তাঁর পরম মিত্র হওয়ার কারণে তাঁকে বোঝান। এ রকম বহুবার নিজের শরীরের কথা চিন্তা না করে সংগঠনের জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে উপস্থিত থেকেছেন। একটি বিশেষ কথা আজ সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হবে, তিনি সারা জীবন রেলযাত্রা স্লিপার ক্লাসেই করেছেন। অতি আগ্রহ করলে মাঝে মাঝে এসি ক্লাসে যাত্রা করতেন।

জগদেওরামজী আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যক্তির থেকে কম কিছু ছিলেন না। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না, কিন্তু সন্ন্যাসীর থেকে কম ছিলেন না। তিনি উপবাস করতেন না, কিন্তু ব্রতী ছিলেন। তিনি প্রচারক ছিলেন না, কিন্তু প্রচারকের থেকে কিছু কমও ছিলেন না। তিনি গৃহী ছিলেন না, কিন্তু হাজার হাজার পরিবারে তাঁর ঘর ছিল। তিনি বালাসাহেব দেশপাণ্ডে অথবা গহিরা গুরুজী ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের নির্দেশিত পথের সাচ্চা পথিক এবং একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। ভারতমাতার এরকম সুপুত্র এবং সমস্ত কার্যকর্তার প্রেরণাস্রোত শ্রদ্ধেয় জগদেওরামজী গত ১৫ জুলাই ২০২০, পঞ্চতত্ত্বে বিলীন হয়ে গেলেন। তাঁর স্মৃতি সমস্ত কার্যকর্তাকে নিরন্তর পথ প্রদর্শন করতে থাকবে।

(লেখক অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কেন্দ্রীয় সংগঠন মন্ত্রী)
ভাষান্তর : উত্তম কুমার মাহাত

শোক সংবাদ

পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সহ ছাত্রাবাস প্রমুখ মহিতোষ গোল হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১০ জুলাই কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী ও ২ পুত্র সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে। মহিতোষদার বাড়ি পুর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁচঘরি গ্রামে। পড়াশোনা শেষ করার পর ওই গ্রামেরই আর এক পূর্ণকালীন কার্যকর্তা প্রবোধ কুমার নন্দের অনুপ্রেরণায় ১৯৮৬ সালে উত্তরবঙ্গের খড়িবাড়ি কল্যাণ আশ্রমে পূর্ণকালীন কার্যকর্তা হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি ছাত্রাবাস প্রমুখের দায়িত্ব পালন করে ধীরে ধীরে জেলা, বিভাগ সংগঠন সম্পাদক ও প্রান্ত শিক্ষা প্রমুখের দায়িত্ব নির্বাহ করে অখিল ভারতীয় স্তরে উন্নীত হন।

——————

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের অন্যতম সহ সভাপতি গুরু বিশ্বাস করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৩ জুলাই কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে পরলোকগমন করন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

স্মরণে

তপন ঘোষ অনেক বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাশ ।। তপনদা আমাকে কতভাবে সাহায্য করেছেন তা অল্প কথায় বলে শেষ করা যাবে না। গত ৪০ বছর আমি তপন ঘোষের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ১৯৭৮ সালে আমাদের কাটোয়ার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ওখানকার স্বয়ংসেবক চৈতন্যদার মাধ্যমে। খাকি ড্রেসের প্রতি আমার ছোটোবেলা থেকেই তীব্র আকর্ষণ ছিল। এনসিসি আর স্কাউট করতাম। রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরির হাতে মেডেলও পেয়েছি। তাই গণবেশে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পরেও দ্বিখণ্ডিত ভারতে হিন্দুদের দুর্দশাই আমাকে তপনদার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজের দিনগুলিতেও তপনদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। কলুটোলার রাস্তা হয়ে বৈঠকখানা রোডের বাসায় যাওয়া-আসা করেছি বহুবার। সেখানে অনেককটি ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়ের কথা ভেবে একগাদা সিঙ্গারা, জিলিপি, মুড়ি ও চপ কিনে নিয়ে যেতাম তাঁর বাসায়।

দীপক গাঙ্গুলি, প্রকাশ দাস, শচীনদা (সিংহ) যেমন আমার কলকাতার ফ্ল্যাটে এসেছে, তেমনই তথাগতদা ও তপনদারও পদধূলি পড়েছে। ২০১৯-এর নভেম্বরে আমার মা শয্যাশায়ী। দেবতনুদা ও তপনদা অর্থ সংগ্রহের জন্য এলে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মাড়োয়ারি ভবনে অনেক মিটিঙে আমি তপনদার পাশে থেকেছি। আমার মতো একটুতেই মাথাগরমের মানুষ দাদার কাছে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা শিখেছি।

পূর্বস্থলীর শিবিরে, বর্ধমানের টাউনহলে, কলকাতার মৌলালিতে, রানি রাসমণি রোডের মিছিলে আমি দাদার সঙ্গে থেকেছি। ২০০৭ সালে বেলেঘাটায় তাঁর বোনঝির বিয়েতে আমি বেনারসি শাড়ি নিয়ে গেলে আপত্তি করেছিলেন। গত বছর নভেম্বর মাসে আমি, মা ও তপনদা একসঙ্গে ট্রেনে চেপে আমাদের গ্রমের বাড়ি ধুলিয়ানে গেছিলাম। রাস্তায় অনেক সুখ-দুঃখ ও পরিকল্পনার কথা হয়েছিল। আমি ইজরায়েল যেতে চাইলে তিনি নিষেধ করেছিলেন। গত জানুয়ারিতে আমার মা গত হলে তিনি আমাকে অনেকক্ষণ সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। নেপালে আমার কাছে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কর্মপাগল মানুষটির সেই আশা অপূর্ণই থেকে গেল। দেওঘরের আশ্রমে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন। খুব বড়ো ডাক্তার বলে সব জায়গায় আমার পরিচয় করে দিতেন। দেশভক্ত, পরোপকারী এই বঙ্গবীরকে প্রণাম করতে চাইলে নিষেধ করতেন। কারো বিরুদ্ধে কোনোদিন অভিযোগ করেননি। ২০১৩ সালে গোয়াতে সনাতন সংস্থার হিন্দু অধিবেশনে আমি কিছু অর্থ তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিলাম যাকে মনে হবে তাকে দিয়ে দেবেন — এতটাই ভরসা করতাম তপনদার ওপর। আমেকিায় গেলে আমার সঙ্গে নারায়ণ কাটারিয়ার কথা বলিয়ে দেন তিনি। শিবপ্রসাদ রায়ে পুস্তিকাগুলির সংকলন করার প্রস্তাব আমিই তপনদাকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, টাকা আমি দেব। আমি বহুবার সূর্যসেন স্ট্রিটের এটিএম থেকে টাকা তুলে তাঁর পকেটে গুঁজে দিয়েছি। জানতাম তাঁর প্রয়োজনের কথা। অনেক কজনের মুখের ভাতের ব্যবস্থা করতে হয় তাঁকে। ২০১৪ সালে আমি মসিশাসে থাকার সময় তাঁকে হিমাংশুদার প্রেস থেকে দশহাজার গীতা ছাপিয়ে পাঠাতে বলেছিলাম। তপনদা নিজের টাকা খরচ করে সেই গীতা আমার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই তপনদাকে কি ভুলতে ভোলা যায়! আমার সহোদর ভাই-বোন নেই। কিন্তু তিনি বড়দার মতো আমার আপনজন ছিলেন। দুর্মুখেরা যাই বলুক, তিনি অনেক বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন। তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষার সামনে নিজেকে বড়োই ছোটো মনে হতো। তিনি চিরদিন আমার অনুপ্রেরণার স্রোত হয়ে থাকবেন। তাঁকে আমার শতকোটি প্রণাম।

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

(৫১)